আমার
বাংলা বই

পঞ্চম
শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

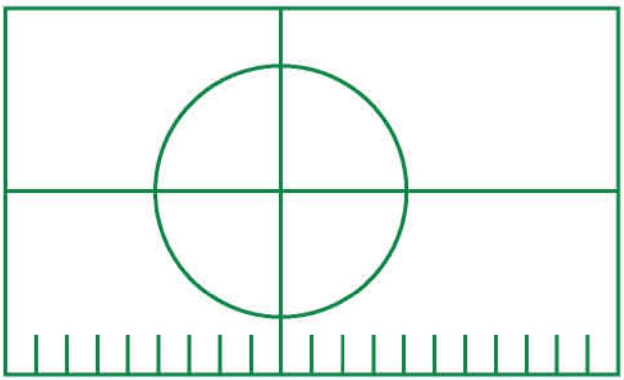

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')

১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')

৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' X $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

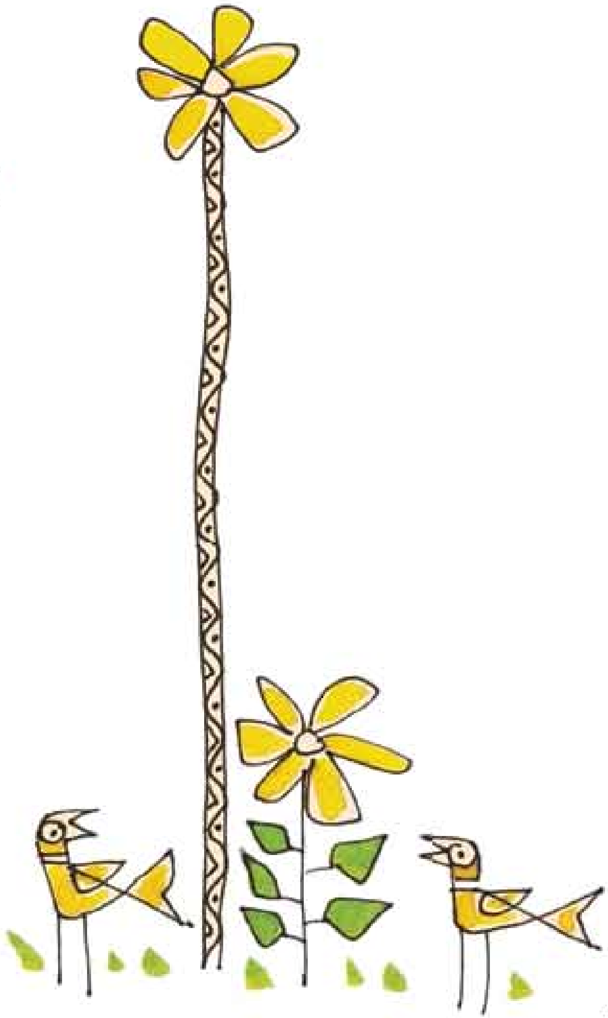

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

হায়াৎ মামুদ
মহাম্মদ দানীউল হক
ড. মাসুদুজ্জামান

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনীমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিমণ্ডল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন :

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন :

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্রেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো :

- শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- শুদ্ধ উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- ঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোদ্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোদ্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন-অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

লেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জুটিতে এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাক্যে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে :

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা-দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করাবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে- তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানোর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য।শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন :

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে :

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন-নদী, ঋতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা বলা;
- নিজের ভাষায় পঠিত বিষয়বস্তু বলা ইত্যাদি।

উল্লিখিত শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন-কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ

এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা দেয়ালে টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উত্তর লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দও যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসা করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান শুদ্ধ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসা করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে যৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনে যাতে সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা-শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবনঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. এই দেশ এই মানুষ	১
২. সংকল্প	৬
৩. সুন্দরবনের প্রাণী	১০
৪. হাতি আর শিয়ালের গল্প	১৬
৫. ফুটবল খেলোয়াড়	২২
৬. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ	২৬
৭. ফেব্রুয়ারির গান	৩১
৮. শখের মৃৎশিল্প	৩৪
৯. শব্দদূষণ	৪১
১০. স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন	৪৪
১১. স্বদেশ	৫০
১২. কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা	৫৬
১৩. অবাক জলপান	৬৪
১৪. ঘাসফুল	৭৩
১৫. মাটির নিচে যে শহর	৭৬
১৬. শিক্ষাগুরুর মর্যাদা	৮১
১৭. ভাবুক ছেলেটি	৮৫
১৮. দুই তীরে	৯১
১৯. বিদায় হজ	৯৫
২০. দেখে এলাম নায়াগ্রা	১০১
২১. রৌদ্র লেখে জয়	১০৬
২২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	১০৯
২৩. শহিদ তিতুমীর	১১৫
২৪. অপেক্ষা	১২০
● শব্দের অর্থ জেনে নিই	১৩০

এই দেশ এই মানুষ

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।" কবির এ কথার অর্থ – আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। আমরা বাঙালি। বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাংলায় কথা বলে। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্চঙ্গা ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সবাই মিলেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে। এরকম খুব কম দেশেই আছে। আবার আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।

বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচিত্র। কেউ জেলে, কেউ কুমার, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করছে। গড়ে তুলছে এই দেশ।

ভাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটি ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। হিন্দুদের দুর্গা পূজাসহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ। বৌদ্ধদের আছে বুদ্ধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টানদের আছে ইস্টার সানডে আর বড় দিন। এছাড়াও রয়েছে নানা উৎসব। পহেলা বৈশাখ- নববর্ষের উৎসব। রয়েছে রাখাইনদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।

পহেলা বৈশাখের উৎসব

২০২৩

পার্বত্য জেলার ঘরবাড়ি

পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের। মিল আমাদের একটা জায়গায়- সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন তাই ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের বেলাভূমি। এজন্য দেশের নানা প্রান্ত যেমন ঘুরে দেখা দরকার তেমনি দরকার আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, পরস্পর মেলামেশা করা। কাছাকাছি আসা, মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র– এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। জননী যেমন স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

২০১০

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য প্রকৃতি বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর স্বজন সার্থক সাংগ্রাই বিজু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি	সৌভাগ্য	বৈচিত্র্য	বেলাভূমি	প্রান্তর	সার্থক

ক. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর ....।

গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের ....।

ঘ. একই দেশ অথচ কত ....।

ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, ..., পাহাড়, সমুদ্র– এইসব।

চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই .... হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?
খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?
গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?
ঘ. "দেশ হলো জননীর মতো।" দেশকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?
ঙ. জেলেদের পেশা কী? তারা যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের কী হতে পারে?
চ. "ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"– এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র– এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। মা যেমন আমাদের স্নেহমমতা, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশও তেমনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

২০২৫

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাঙালি	অবাঙালি	বন্ধু	শত্রু	দেশ	বিদেশ	সার্থকতা	ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক .... আছে।

খ. আমরা সবাই পরস্পরের...................................।

গ. .... হলো জননীর মতো।

ঘ. আমাদের .... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার বন্ধু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

এখানে,	মনির, রবিন	– বিশেষ্য পদ
	খুব ভালো	– বিশেষণ পদ
	তার	– সর্বনাম পদ
	ও	– অব্যয় পদ
	খেলে	– ক্রিয়া পদ

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুঁজে বের করি।

"বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। উচিত সবার সবাইকে ভালোবাসা।"

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পরপর) টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

২০২০

সংকল্প
কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে,–
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে
মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা
বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
চন্দ্রলোকের অচিন্‌পুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্‌
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে॥
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১.কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে–সে বদ্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প বদ্ধ যুগান্তর দেশান্তর বরণ মরণ-যন্ত্রণা দুঃসাহসী চন্দ্রলোক অচিনপুর ফেড়ে

৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

সংকল্প – প্রতিজ্ঞা ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।

বন্ধ	–	বন্ধ	ইঙ্গিত	–	ইশারা
দেশান্তর	–	অন্যদেশ	বরণ	–	সাদরে গ্রহণ
জগৎ	–	পৃথিবী			

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লেখ?
গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?
ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?
ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ
আঁকব	আঁকিব
দেখব	দেখিব
ঘুরছে	ঘুরিতেছে
মরছে	মরিতেছে

চলিত রূপ	সাধু রূপ
ছুটছে	ছুটিতেছে
আসছে	আসিতেছে
চলছে	চলিতেছে

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

ক. আমি কাজটি করি।
আমি কাজটি করেছিলাম।
আমি কাজটি করব।

উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব– এগুলো 'করা' ক্রিয়াপদটির বিভিন্নরূপ। যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে। যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

কিশোর বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

(গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করি

থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব

ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতীত
থাকব	থাকি	থেকেছিলাম
....	....	....
....	....	....
....	....	....

৭. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র–এর পরে 'ণ' বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর , বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকেতগুলো লিখি।

৯. আমার সংকেতগুলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি - পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ,(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন।'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ঝিঙে ফুল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুন্দরবনের প্রাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্তু।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা। সিংহ বললেই মনে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এই বাঘ থাকে সুন্দরবনে। এ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ঙ্কর। এর চালচলনও রাজার মতো। সুন্দরবনের ভেজা স্যাঁতসেঁতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।

২০২০

শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও খায়। এক সময় সুন্দরবনে ছিল চিতাবাঘ ও গুলবাঘ। কিন্তু এখন আর এসব বাঘ দেখা যায় না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গাল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্তু, পশুপাখি এক অমূল্য সম্পদ। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণিকুল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। শকুন দেখতে যে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খায় এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু শকুন এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়—বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি।

চিত্রা হরিণ

গণ্ডার

হাতি

শকুন

মদন টাক

বুনো শুয়োর

পশুপাখি ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। প্রকৃতিতে যদি বিপর্যয় ঘটে তবে এদের জীবনও বিপন্ন হয়। সুন্দরবনের অনেক প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব প্রাণী আছে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর অমূল্য বিলুপ্তপ্রায়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর বিলুপ্তপ্রায়

ক. বাংলাদেশ .... সৌন্দর্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার .... সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে .... বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার ....।

ঙ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের .... সম্পদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন .... পাখি।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।
ক্যাঙ্গারু	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড় আর সামনের দু-পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো এরা হাঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য। চিতাবাঘ অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে ও গাছে উঠতে পারে।
গণ্ডার	কালো ও ধূসর রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ক্যাঙ্গারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?
খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।
ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?
ঙ. পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন .... বিশেষ্য পদ

ক্ষতিকর .... বিশেষণ পদ

সে .... সর্বনাম পদ

খায় .... ক্রিয়া পদ

ছাড়া .... অব্যয় পদ

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

ক. আকৃতি –

খ. রং –

গ. কোথায় দেখা যায় –

ঘ. আবাসস্থল –

ঙ. খাদ্যাভ্যাস –

২০২৫

৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা–

১. ভারত ২. বাংলাদেশ
৩. অস্ট্রেলিয়া ৪. আফ্রিকা

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

১. সিংহ ২. হাতি
৩. বাঘ ৪. উট

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

১. সিলেট ও খুলনার ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের
৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের ৪. উপরের সবখানে

ঘ. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?

১. ঈগল ২. শকুন
৩. চিল ৪. কাক

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

১. চিতা বাঘ ২. চিত্রা হরিণ
৩. ভালুক ৪. গন্ডার

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি– যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। পরে শ্রেণির সবার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

হাতি আর শিয়ালের গল্প

সে অনেক–অনেক দিন আগের কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দর সবুজ বন, ঝোপঝাড়। আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া। এরকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকত লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে।

মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে। কী করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দাকানুন। ও-দিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব। হাজার রকমের প্রাণী, অসংখ্য পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো কি তাড়া খেয়ে মস্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল। হাতিটার সে-কী বিশাল শরীর। পাগুলো বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড় এতটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়েও অসীম জোর। এই শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার। মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি।

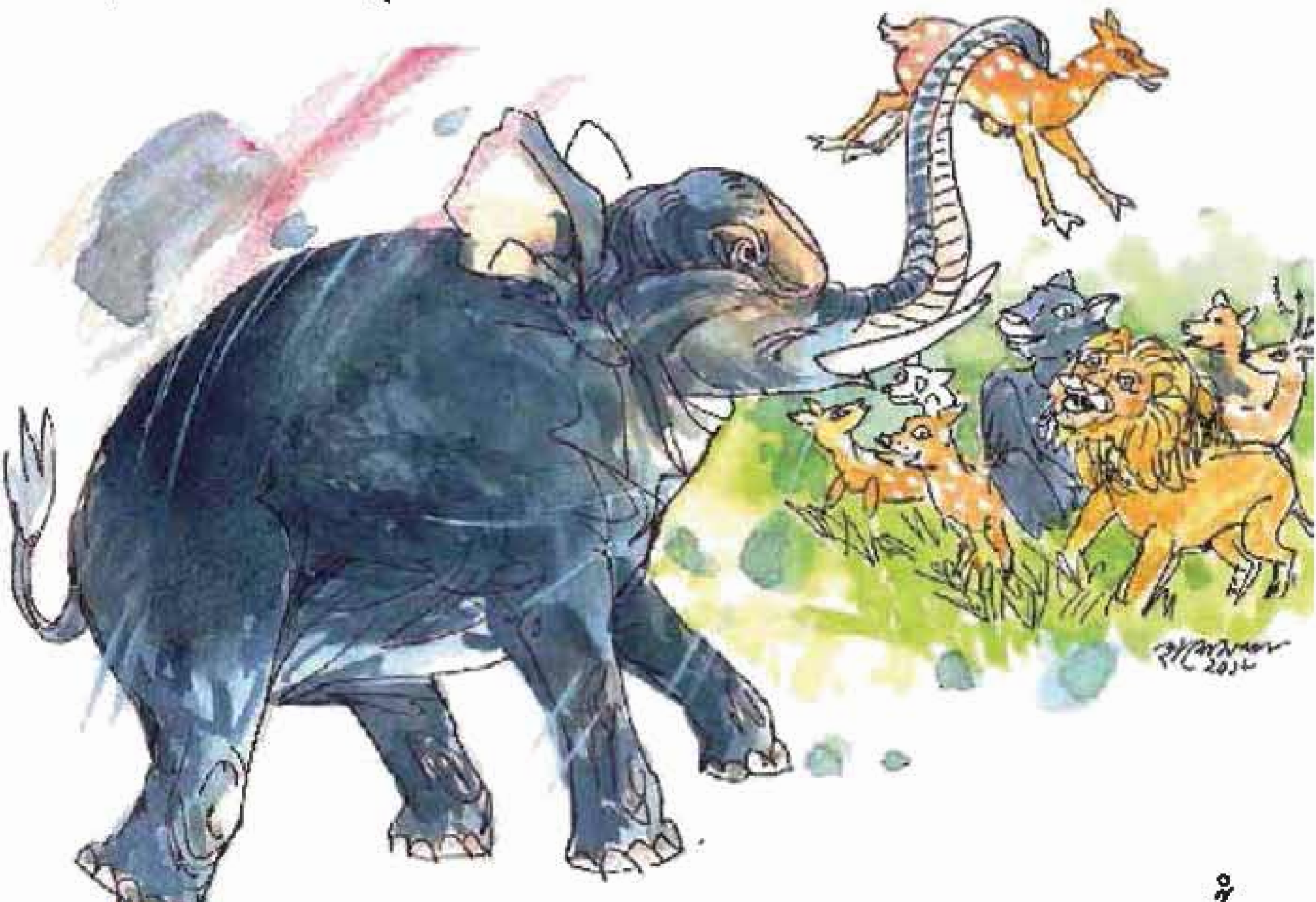

তো–যেই-না হাতিটার ঐ বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দুষ্টু হাতিটার সে-কী তুলকালাম কাণ্ড! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে পরম নিশ্চিন্তে বসেছিল পাখি, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইঁদুর, গুব্‌রে পোকার দল। তারা বুঝতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগম্ভীর ভারিক্কি চালের কেশর দোলানো অমিত শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শঙ্কিত। কখন জানি কী হয়!

একবার তো কী জানি কী হয়েছে। নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেকবার ছোট্ট একটা পিঁপড়ে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও অহংকারী। এই নিয়ে বনের কারো মনে শান্তি নেই।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সন্ধ্যায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, ভালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়াল, শিয়াল সবাই সলা-পরামর্শ করতে বসল। শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল।

দিন আসে, দিন যায়। একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ওই দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।

হাতি তো শিয়ালের কথা শুনে মহা খুশি। আচ্ছা চল। নদীর পারে এসে শিয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন। এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

কিন্তু মস্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী! হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল। অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

শিয়াল হাতিকে বলল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই তো নদীতে নিয়ে এসেছি। বনের যত প্রাণী ছিল, সবাই শিয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমস্বরে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শিয়াল ভায়া
আর দেখব না হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নাচছি সবাই তা-ধিন তা-ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শঙ্কিত শক্তিধর আস্তানা উদ্গ্রীব সমস্বরে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের	অহংকার	তিরিক্ষি	তুলকালাম কাণ্ড	হুঙ্কার	মেদিনী	তটস্থ	শঙ্কিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে .... কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. .... পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত .... হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ .... দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে .... বাঁধিয়ে দিয়েছে।

চ. .... ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ .... বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত .... কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?
খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?
গ. গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ঘ. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।
ঙ. হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।
চ. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?
ছ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?
জ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?
ঝ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কুৎসিত	অহংকার	নিরহংকার	ভয়	সাহস	স্বাধীন	পরাধীন

ক. আমরা .... দেশের অধিবাসী।

খ. .... পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল .... হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে .... থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

১. বাঘ ২. শিয়াল

৩. হাতি ৪. সিংহ

খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি এলো?

১. সিংহ ২. শিয়াল

৩. ভালুক ৪. বাঘ

গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

১. শিয়াল সাঁতার জানে ২. শিয়াল খুব সাহসী

৩. শিয়াল বুদ্ধিমান ৪. শিয়াল হাতির বন্ধু

ঘ. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

১. হাতির অহংকার ২. হাতির লম্বা শুঁড়

৩. হাতির ভারী শরীর ৪. হাতির বোকামি

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

১. হাতির অত্যাচারের জন্য ২. হাতি খুব বড় বলে

৩. হাতির ভয়ে ৪. হাতি সাঁতার জানে বলে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য	....	....
ধ্বনি	....	....
শক্তিশালী	....	....

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুষ্টু – বিশেষণ

হাতি –

বুদ্ধিমান –

এবং –

আমি –

চায় –

৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বইি তৈরি করি।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীম উদ্‌দীন

আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাখিছে প্রতি গিটে গিটে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেঁক দিতে ভাঙা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি ছমাসের তরে পঙ্গু সে হলো হায়,
ফুটবল-টিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙা খাটিয়ার 'পরে।
টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।
সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে।

বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের আগে ধাও,
মারো জোরে মারো-গোলের ভিতরে বলেরে ছুঁড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল, চারদিক হতে ওঠে কোলাহলকল,
জীবনের পণ, মরণের পণ, সব বাধা পায়ে দল।
গোল-গোল-গোল— মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
ভাঙা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা-কলরব করে,
ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
বেঘুম রাত্র কেটে যায় তার চিৎকার করি ডাকি।
সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা-কলরবে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে। ১৩৩০

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা–পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। তার জন্যই সকল দর্শক খেলার আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত পটি মালিশ ড্রিবলিং বজ্র কোলাহলকল মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্র	পটি	মালিশের	ক্ষত	মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের .... রয়েছে ।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে .... বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা .... করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর .... শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. .... পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা দাও।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক. ....,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,

.... ।

গ. গোল–গোল–গোল– মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

.... ।

৬. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম–অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : ....

২. বিদ্যালয়ের নাম :..

৩. শ্রেণি :..

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:..

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:..

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং .... ডাকঘর/মহল্লা ....

উপজেলা .... জেলা ২০২৫

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং .... ডাকঘর/মহল্লা ....

উপজেলা .... জেলা...

৭. জন্ম তারিখ ....

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক. ....

খ. ....

গ. ....

....

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

জসীম উদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

কবি জসীম উদ্‌দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জসীম উদ্‌দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা 'কবর', কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ছোটদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার'. 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশি' বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

দুরন্ত এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। কিশোর বয়সে হঠাৎ করে তাঁর বাবা-মা মারা গেলেন। বদলে গেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

সময়টা ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। যশোরের পাকিস্তানি ছুটিপুর ক্যাম্প। একটু দূরে গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এঁদেরই নেতৃত্বে ছিলেন ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। রাজাকারদের সহায়তায় তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া। কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাৎ এসে লাগে তাঁর গায়ে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। কৌশল হিসেবে বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি। উদ্দেশ্য–একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন, শত্রুদের এ রকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

কিন্তু হঠাৎ মর্টারের একটা গোলা এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ

হলেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে নূর মোহাম্মদ শেখ এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন। সাহসী এই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

এ রকমই আরেক যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ। ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় দারুণ দুরন্ত ছিলেন। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের মতো মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

দিনটি ছিল একাত্তরের ৮ই এপ্রিল। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ করবে। এজন্যে তাঁরা মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সাথে নিয়ে আসে সাতটি স্পিডবোট আর দুটি মোটর লঞ্চ। স্বল্পসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ছিল অবধারিত। তবু মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যান নি। আবদুর রউফ নিজেই দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা করার। হালকা একটা মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়ে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের বললেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি স্পিডবোটই ডুবে গেল। বাকি লঞ্চ দুটো থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা পিছু হটতে থাকল। এ রকম মুহূর্তেই হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল তাঁর উপর, তিনি শহিদ হলেন। বীরের রক্তস্রোতে রঞ্জিত হলো মাটি। রাঙামাটি জেলার বোর্ড বাজারের কাছে নানিয়ারচরের চিংড়িখালের কাছাকাছি একটি টিলার উপর সমাহিত হন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ। পরবর্তী সময়ে সমাধিকে স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরিত করে সরকার।

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ

একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কতভাবেই না যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। এ রকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার খুলনা দখলই লক্ষ্য। ভৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে ধেয়ে আসছেন তাঁরা।

জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসে। এমন সময় একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের ওপরে বোমা পড়েছিল। ইঞ্জিন বিকল হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল পলাশে। তাঁর ডান হাতটি উড়ে গিয়েছিল। তিনি আহত অবস্থায় ঝাঁপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল আসন্ন অবধারিত রক্তস্রোতে রঞ্জিত শায়িত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ	নান্নু মিয়া	শিপইয়ার্ডের	১৯৪৩ ৮ই মে	রুহুল আমিন

ক. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ....।

খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে .... সেদিন এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।

গ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ........................ সালের .... মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ. খুলনা .... কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ .... ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?

খ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।

গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

দুরন্ত	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম	....	....
সুনাম	....	....
বীর	....	....
জয়	....	....
জীবন	....	....

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে   ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে

৩. বাংলাদেশ নেভিতে   ৪. কোনোটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম–

১. ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি   ২. ১৯৩৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি

৩. ১৯৩৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি   ৪. ১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

১. পাঁচটি   ২. আটটি

৩. সাতটি   ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়–

১. বোয়ালমারির সালামতপুর   ২. বজ্রিবাজার

৩. নানিয়ারচরের চিংড়িখাল   ৪. বুড়িঘাট

ঙ. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা–

১. নূর মোহাম্মদ শেখ   ২. মুন্সী আবদুর রউফ

৩. মোস্তফা কামাল   ৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক. শহিদ দিবস–

খ. স্বাধীনতা দিবস–

গ. বাংলা নববর্ষ–

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস–

ঙ. বিজয় দিবস–

ফেব্রুয়ারির গান

লুৎফর রহমান রিটন

দোয়েল কোয়েল ময়না কোকিল
সবার আছে গান
পাখির গানে পাখির সুরে
মুগ্ধ সবার প্রাণ।

সাগর নদীর ঊর্মিমালার
মন ভোলানো সুর
নদী হচ্ছে স্রোতস্বিনী
সাগর সমুদ্দুর।

ছড়ায় পাহাড় সুরের বাহার
ঝরনা-প্রকৃতিতে
বাতাসে তার প্রতিধ্বনি
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

গাছের গানে মুগ্ধ পাতা
মুগ্ধ স্বর্ণলতা
ছন্দ-সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেকে (যাদের নাম জানা যায় নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফর রহমান রিটন 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুগ্ধ ঊর্মি ঊর্মিমালা স্রোতস্বিনী সমুদ্দুর বাহার স্বর্ণলতা প্রতিধ্বনি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্দুর	মুগ্ধ	বাহার	প্রতিধ্বনি	মন ভোলানো	স্রোতস্বিনীতে

ক. বাংলার সৌন্দর্য দেখে আমি ....।

খ. গ্রীষ্মকালে ফলের .... দেখা যায়।

গ. সাত .... তের নদী পার হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার না।

ঘ. .... ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকা।

ঙ. রংধনুর .... রং এ আকাশ রঙিন হয়েছে।

চ. সকল মানুষের কণ্ঠে একই ....।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?
খ. পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?
গ. প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?
ঘ. আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?
ঙ. 'শহিদ ছেলের দান' হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?

২০২০

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মনের কথা কীভাবে বলব?

১. মায়ের ভাষায় ২. বাবার ভাষায়

৩. দাদার ভাষায় ৪. মামার ভাষায়

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?

১. বিরক্ত ২. মুগ্ধ

৩. রাগ ৪. খুশি

গ. নদীর অপর নাম কী?

১. স্রোতস্বিনী ২. পুকুর

৩. সমুদ্র ৪. খাল

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?

১. প্রজাপতি ২. হরিণ

৩. মানুষ ৪. পাখি

ঙ. ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?

১. ভাইয়ের ২. মামার

৩. বাবার ৪. মানুষের

৬. কর্ম-অনুশীলন

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

লুৎফর রহমান রিটন

কবি-পরিচিতি

লুৎফর রহমান রিটন ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা করে তরুণ বয়সেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছড়া ছাড়াও তিনি গল্প উপন্যাস লেখেন। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ : 'ঢুঁড়ুরি', 'ঢাকা আমার ঢাকা', 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ', 'ভূতের বিয়ের নিমন্ত্রণে', 'বাচ্চা হাতির কাণ্ডকারখানা' ইত্যাদি।

শখের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখতে নিয়ে যাব।

শখের হাঁড়ি

আমরা ছিলাম চারজন– আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোট ভাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই গেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আঁকার জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে। মেলার একটু কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই, খালুই। আরও কত কী! বসেছে বাঙ্গি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের বিচিত্র সব মাটির হাঁড়ি। ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, ষাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির হাঁড়ির দিকে। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম-এটা কিসের হাঁড়ি?

মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই তো সুন্দর।

আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই বোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয়। যেমন– বউ জামাই, কৃষক, নথপরা ছোট্ট মেয়ে–নানা রকমের মাটির টেপা পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। মামা বুঝিয়ে বললেন– যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস। যেমন– কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী!

টেপা পুতুল

মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো। দোআঁশ মাটি তেমন আঠালো নয়। আর বেলে মাটি তো ঝরঝরে – তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছে।

টেপা পুতুল

২০২০

কাঠের চাকায় মাটির পাত্র তৈরি হচ্ছে

আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। সবকিছুর আগে যেটা দরকার তা হলো একটা কাঠের চাকা। এই চাকায় নরম মাটির তাল লাগিয়ে নেন কুমাররা। তারপর চাকাটি জোরে ঘোরান। আর হাত দিয়ে মাটির তাল ধরেন। এভাবে নানা আকারের মাটির পাত্র ও নানা জিনিস তৈরি করেন কুমাররা।

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছোট কলস কিনলাম। মামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ- এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন। আর রং তৈরি করেন শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রংও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদমা, বাতাসা, মুড়কি ও খৈ কিনে শখের হাঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম। খুব মজা হলো।

মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমারপাড়ায় নিয়ে যাব। পরদিন আমরা দেখতে গেলাম কুমারপাড়া। আনন্দপুর গ্রামের উত্তর দিকে আট-দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কুমারপাড়া। এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন। কেউ-বা এগুলো সারি সারি করে শুকোতে দিচ্ছেন রোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা। উঁচু ছোট্ট ঢিবির মতো এই চুলা। মাটির পোড়া গন্ধ

পাচ্ছি। আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে। মামা বললেন, হাঁড়ি কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো। এর অন্য নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরানো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। মাটির ফলকে ছবি এঁকে শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে! ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি ভবনে আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমাররা এসব তৈরি করছেন। বললাম, আমরা এসব পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই।

মামা বললেন, সুযোগমতো এক সময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

–সংগৃহীত

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ   টেপা পুতুল   নকশা   শালবন বিহার   টেরাকোটা   মৃৎশিল্প   শখের হাঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ	নকশা	মৃৎশিল্প	টেপা পুতুল

ক. এই যে .... দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি .... ।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে .... বলে।

ঘ. আমরা মেলা থেকে অনেক .... কিনলাম।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

১. ষোলই ডিসেম্বর ২. পহেলা বৈশাখ

৩. একুশে ফেব্রুয়ারি ৪. পহেলা ফাল্গুন

খ. মামা কোথায় পড়েন?

১. ঢাকা কলেজে

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩. ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে

৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনস্টিটিউটে

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে –

১. বাঁশ ২. কাঠ

৩. পানি ৪. মাটি

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে –

১. চারুশিল্প ২. মৃৎশিল্প

২. কারুশিল্প ৪. দারুশিল্প

ঙ. কুমার সম্প্রদায় কিসের কাজ করে–

১. বাঁশের কাজ ২. কাঠের কাজ

৩. পাকা বাড়ির কাজ ৪. মাটির কাজ

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন–

১. আম ও লাউ পাতা থেকে ২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে

৩. সরিষা ফুল থেকে ৪. পান ও চুন থেকে

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম–

১. টেপা পুতুল ২. টেরাকোটা

৩. শখের হাঁড়ি ৪. মৃৎশিল্প

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?
খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?
গ. শখের হাঁড়ি কী রকম?
ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?
ঙ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?
চ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।
ছ. টেরাকোটা কী?
জ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?
ঝ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?
ঞ. মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি–প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির জিনিস, যেমন–কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝ?
খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন?
গ. কেন কুমারদের কাছে এসব কাজ সহজ?

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লিখি।

ক. মৃৎশিল্প
খ. শখের হাঁড়ি
গ. টেরাকোটা
ঘ. টেপা পুতুল

২০২০

৭. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

কান্তজির মন্দির ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটা বাংলার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।

পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ-পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর টেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি।

শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টম শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।

মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে পরবর্তী পনেরো শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে ওঠে। মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক,পাত্র, অলংকার ও মূর্তি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমারপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই।

অথবা

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখি।

শব্দদূষণ

সুকুমার বড়ুয়া

গরু ডাকে হাঁস ডাকে-ডাকে কবুতর
গাছে ডাকে শত পাখি সারা দিনভর।
মোরগের ডাক শুনি প্রতিদিন ভোরে
নিশিরাতে কুকুরের দল ডাকে জোরে।
দোয়েল চড়ুই মিলে কিচির মিচির
গান শুনি ঘুঘু আর টুনটুনিটির।

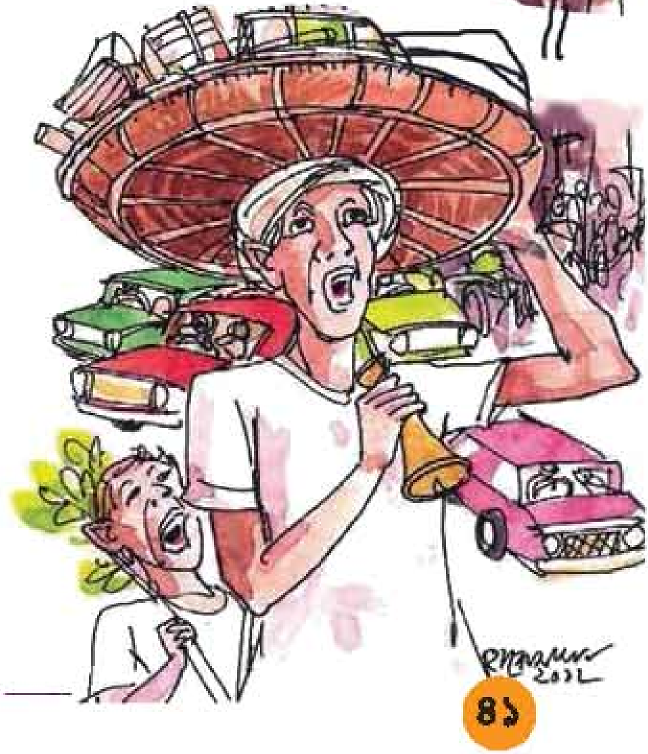

শহরের পাতি কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুম দেয়া মুশকিল হর্নের হাঁকে।
সিডি চলে, টিভি চলে, বাজে টেলিফোন
দরজায় বেল বাজে, কান পেতে শোন।
গলিপথে ফেরিঅলা হাঁকে আর হাঁটে
ছোটদের হইচই ইশকুল মাঠে।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা—শব্দদূষণ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নিশিরাত কিচির মিচির ফেরিঅলা শব্দদূষণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা	নিশিরাত	শব্দদূষণ	কিচির মিচির

ক. .... চেঁচামেচি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ভোর বেলাতেই পাখির .... শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

গ. .... হাঁক দিচ্ছে–থালাবাসন চাই?

ঘ. .... আমাদের শোনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?
খ. শহরে কী কারণে শব্দদূষণ হয়?
গ. কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?
ঘ. গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ		
শব্দ		
রাস্তাঘাট		
জীবনযাত্রা		
হাটবাজার		

২০২৫

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা–শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

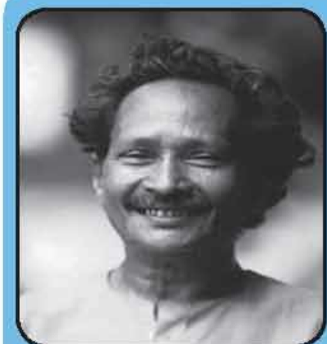
সুকুমার বড়ুয়া

কবি-পরিচিতি

সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : পাগলা ঘোড়া, ভিজে বেড়াল, চন্দনা রঞ্জনার ছড়া, এলোপাতাড়ি, নানা রঙের দিন, চিচিংফাঁক প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি। এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশবাসীকে করতে হয় এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে। দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাঁদের জুগিয়েছেন ভরসা ও সাহস। অপেক্ষা করেছেন শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার। সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন। আর দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁরা ছিলেন নানা পেশার– কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক। আরও ছিলেন শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা ও নানা পেশার লোক। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবনযাপন করতে পারছি। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। সেই অসংখ্য মহান আত্মদানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নিব।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে বিরামহীন। চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে। পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা।

গোবিন্দচন্দ্র দেব

সেলিনা পারভীন

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

২০১৮

হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী। পাষণ্ড কিছু লোকজন যোগ দেয় ওই সব বাহিনীতে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের ওই হত্যা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে।

রণদাপ্রসাদ সাহা

মুনীর চৌধুরী

রাশীদুল হাসান

পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায় নি। হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। এই কুরআন পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই গুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহংকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করে তারা। হত্যা করে আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক 'সংবাদ' অফিসে আগুন দেয়। লেখক ও সাংবাদিক শহিদ সাবের সে রাতে ঐ অফিসেই ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় সংবাদ অফিসে পুড়ে মারা যান তিনি। শহিদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।

তারা হত্যা করে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা তাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আয়ুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়। ৮৪ বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পান নি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে। তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে ডাকত 'দানবীর' বলে। হত্যা করা হয় তাঁকে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নূতনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা তাঁকেও রেহাই দেয় নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। প্রতিভাবান এই সুরসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান, যশস্বী ও প্রতিভাবানদের। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না।

শত্রুরা তুলে নিয়ে যায় প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আবদুল আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এঁরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায় নি।

শহীদুল্লা কায়সার

আনোয়ার পাশা

ফজলে রাব্বী

তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস'। এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাঁদের স্মরণ করব চিরদিন। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তুলব। তবেই তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবরুদ্ধ   অবধারিত   আত্মদানকারী   নির্বিচারে   বরেণ্য   পাষণ্ড   মনস্বী   যশস্বী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবরুদ্ধ	অবধারিত	আত্মদানকারী	বরেণ্য	নির্বিচারে	যশস্বী	পাষণ্ড	মনস্বী

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় ....।

খ. দেশের ভিতরে .... জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও .... মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান .... হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা .... হত্যা করে নিদ্রিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের .... শিক্ষক।

ছ. .... কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক .... চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখি।

ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

জ. কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য	মেধাবী
মেধা আছে এমন যে জন	নিরহংকার
অহংকার নেই যার	বরেণ্য
বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা	অপূরণীয়
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	নির্বিচার

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ
৩. ১৯৭১ সালের ঊনত্রিশে মার্চ
৪. ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়–

১. 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে
২. 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
৩. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে
৪. 'বিজয় দিবস' হিসেবে

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত–বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় –

১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
৪. সংবাদপত্র অফিসে

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত	জাগ্রত	স্বাধীন	পরাধীন	সাধু	অসাধু	লোভী	নির্লোভ	সরল	গরল

ক. .... অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন শহিদ সাবের।

খ. দেশ .... হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক .... জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক .... সন্ন্যাসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও ....।

৭. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

স্বদেশ

আহসান হাবীব

এই যে নদী
নদীর জোয়ার
নৌকা সারে সারে,
একলা বসে আপন মনে
বসে নদীর ধারে–
এই ছবিটি চেনা।
মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাখি–
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ
নানা কাজের মানুষগুলো
আছে নানান বেশ।
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর
হাটের মানুষ হাটে।
দেখে দেখে একটি ছেলের
সারাটি দিন কাটে।

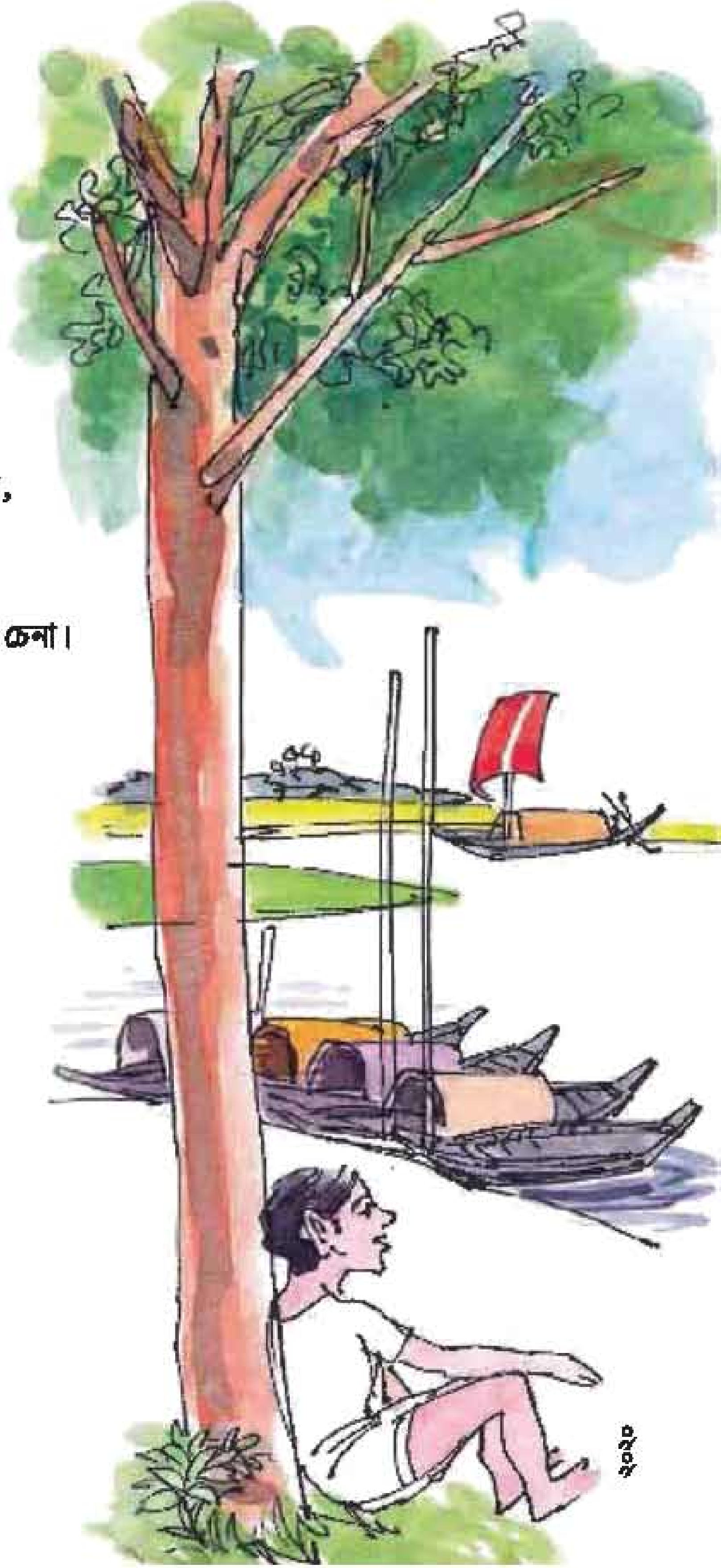

এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকটুক।
কে তুমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভালোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

' এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পারি সবই।'

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। ‘স্বদেশ’ কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি – সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে	শিল্পী	পাখপাখালির	কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা করত .... দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য .... একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র ....।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় .... কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. ‘সব মিলে এক ছবি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য-শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে গাছে পাখি। এঁকেবেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর এক দিকে পাহাড় আর অন্য দিকে সাগর। সবকিছুতেই প্রকৃতির এক অপরূপ ছোঁয়া। শিল্পী রং-তুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন। কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির এই মন জুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর মাঠ চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

গ. এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,

নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এদেশ ছবির মতো। এদেশের প্রতিটি ঋতু বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে নানান রং ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও নানারকমের বেশভূষা পরেন। সব মিলিয়ে সুন্দর এদেশ।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?

১. জেলেদের জাল　　২. গাছের গুঁড়ি

৩. খড়ের গাদা　　৪. নৌকা

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে ?

১. খেলাধুলা করে　　২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে

৩. পড়াশোনা করে　　৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

১. রং-তুলি দিয়ে　　২. পেনসিল দিয়ে

৩. নিজের মনের মধ্যে　　৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

ঘ. 'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি

২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি

৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি

৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. 'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'– কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

১. ছেলেটির মুখের রং

২. ছেলেটির মুখের গড়ন

৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি

৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘ এই যে ছবি ....

................মতো দেশ,

.... দেশের মানুষ

নানা রকম বেশ,

বাড়ি বাগান ....

সব মিলে এক................

নেই .... নেই ....তবুও

আঁকতে পারি সবই।’

৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. একলা বসে আপন মনে বসে ....। পুকুর পাড়ে/গাছের তলে/ নদীর ধারে

খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি .... নয় কেনা। টাকায়/কড়িতে/ সোনায়

গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি ....। হলুদ পাখি/জারুল ফুল /শালিক পাখি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

কবি আহসান হাবীব ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছন্দ ও শব্দ সহজেই মন কাড়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। তিনি দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সাহিত্যের পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে’ তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১০ই জুলাই ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক রাজা। রাজার একটাই পুত্র। রাজপুত্রের সঙ্গে সেই রাজ্যের রাখাল ছেলের খুব ভাব। দুই বন্ধু পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। রাখাল মাঠে গরু চরায়, রাজপুত্র গাছতলায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করে। নিঝুম দুপুরে রাখাল বাঁশি বাজায়। রাজপুত্র তার বন্ধু রাখালের গলা জড়িয়ে বসে সেই সুর শোনে। বন্ধুর জন্য বাঁশি বাজিয়ে রাখাল বড় সুখ পায়। আর, তা শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে। রাজপুত্র বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে রাজা হলে রাখালকে তার মন্ত্রী বানাবে।

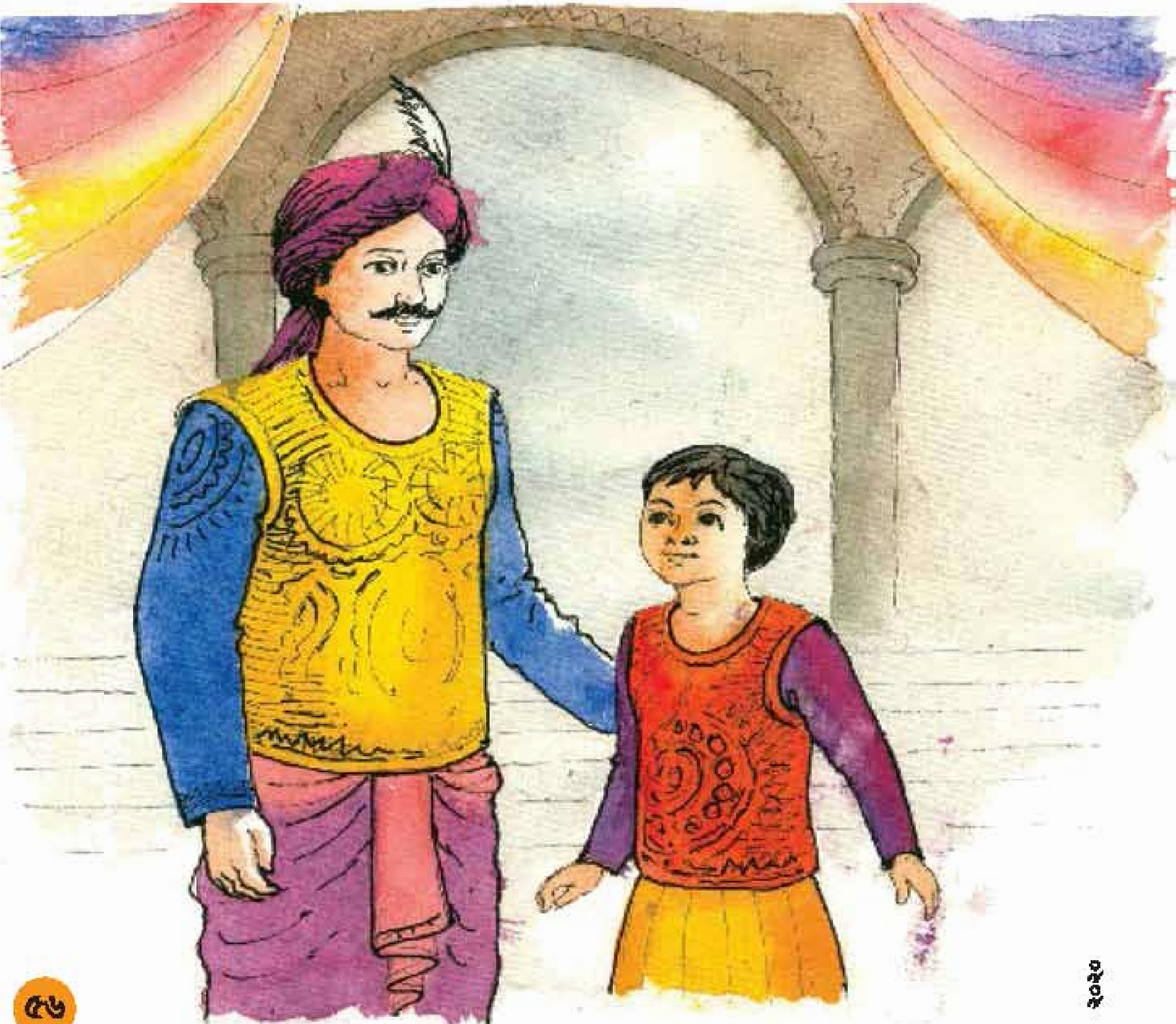

তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরি। রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ। এত সুখের মধ্যে রাখালবন্ধুর কথা মনে পড়ে না। রাজপুত্র বন্ধুকে ভুলে যায়।

এদিকে, রাখালবন্ধুর কিন্তু খুব মনে পড়ে বন্ধু রাজপুত্রের কথা। শেষে সে একদিন চলেই আসে বন্ধুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা অমন গরিব রাখালকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মনভরা কষ্ট নিয়ে সারাদিন প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাজার দেখা মেলে না। দিনশেষে মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল চলে যায়, কেউ তা জানে না।

এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভাঙে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সুচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজ্যজুড়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজা বোঝেন – প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।

কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো। এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার। মেয়েটাকে সেই কাজের জন্য নিয়ে নেন রানি। নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে কী করে থাকে টাকাকড়ি! তখন হাতের সোনার কাঁকন দিয়েই রানিকে কিনতে হয় ওই দাসী। তাই তার নাম কাঁকনমালা।

গায়ের গয়নাগুলো কাঁকনমালার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান রানি। চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নেয়। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

নকল রানি কাঁকনমালার ভয়ে কাঁপতে থাকে কাঞ্চনমালা। কাঁপতে থাকে রাজপুরীর সকলে। সকলে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো আগে এমন ছিল না।

সুচবিঁধা রাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্যে আরেক কী ঘোর ঝামেলা এসে গেছে। দুখিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন। চোখের জল ফেলেন।

হাতে কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না। কীভাবে সুচরাজার যত্ন করবে! কীভাবে তার পাশে দু-দণ্ড বসবে! নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কষ্টের সীমা থাকে না। সুচবিঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একগাদা কাপড় ধুতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন এক পা থামেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালা শোনেন, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অদ্ভুত মন্ত্র। কে জানি বলেই যাচ্ছে:

পাই এক হাজার সুচ
তবে খাই তরমুজ!
সুচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে যেতাম হাট বাজার!
যদি পাই লাখ
তবে দেই রাজ্যপাট!

২০২৫

মাথার বোঝা নামিয়ে কাঞ্চনমালা যান ছুটে তার কাছে। বলেন, লাখ লাখ সুচ চাও তো? আমি দিতে পারি। এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতার পুঁটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে। যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা বলে। অচেনা মানুষ শোনে, মুখ থমথমে হয়ে যেতে থাকে তার।

রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষ সুচ নেবার কথাটাও বলে না। বলতে থাকে অন্য কথা। বলে, আজকের দিন বড় শুভ দিন। আজ হচ্ছে পিটকুড়ুলির ব্রত, আজকের দিনে রানিদের পিঠা বিলাতে হয়– এমনই নিয়ম। নকল রানি পিঠা বানাতে যায়। সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস দেয়। নকল রানি বানায় পিঠা। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না, এমনই বিস্বাদ। দুখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীর মুরলি পিঠা। মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে যায়। এমনই স্বাদ তার। নকল রানি উঠানে আল্পনা দিতে যায়। কোথায় নকশা কোথায় কী– এখানে এক খাবলা রং লেপে দেওয়া, ওখানে এক খাবলা লেপা। দেখতে যে কি অসুন্দর দেখায়! আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা। তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ূর-পুতুল। লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকনমালাকে ডাক দেয়, বলে—হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি সত্যি কথা বল। কাঁকনমালার সেকি রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয়, অচেনা মানুষ আর কাঞ্চনমালার গর্দান নিতে। জল্লাদ ওদের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সুতার পুঁটলিকে হুকুম দেয়। এক গোছা সুতা গিয়ে জল্লাদকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। নকল রানি আবার গর্জে ওঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে:

সুতন সুতন সন্নুলি, কোন দেশে ঘর
সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।

সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ সুতা রাজার গায়ের লাখ লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন মানুষ। সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখেমুখে বিঁধে যায়। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়। কাঞ্চনমালার দুঃখের দিন শেষ হয়।

এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে! কে! সেই রাখালবন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। রাজা ক্ষমা চান তাঁর বন্ধুর কাছে। কথা দিয়ে কথা রাখেন নি। রাজা বলেন, "আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। এই রইল রাজ্য আমার, শুধু তুমি আমার পাশে থেকো! সারা জীবনের জন্য থেকো।" রাখাল বন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন। রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে, প্রজাদের দুঃখ সরিয়ে তাদের মুখে হাসি আনে। সারাদিনের কাজ শেষে রাজা বন্ধুকে নিয়ে যান। পুরানো দিনের মতো রাখালবন্ধু তখন বাঁশি বাজায়, আর রাজা সেই সুর শোনেন। সুখে রাজার মন ভরে ওঠে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আষ্টেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুঁটলি ফরমাস ঘোর ফুরসত

টনটন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের	বিস্বাদ	আষ্টেপৃষ্ঠে	পুঁটলিটি	ফুরসত	টনটন

ক. তার হাতের রান্না এমন .... যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃদ্ধ লোকটি তার .... সযত্নে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার .... নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় .... করছে।

ঙ. তারা দুজন .... বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে .... বেঁধে রেখেছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত?

খ. রাজপুত্র রাখাল বন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?

গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?

ঘ. তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।

ঙ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?

চ. তুমি কী মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?

ছ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?

জ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?

ঝ. কাঞ্চনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঞ. গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? বর্ণনা দাও।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কান্না	হাসি	চেনা	অচেনা	ভালো	মন্দ	বড়	ছোট	আলো	অন্ধকার

ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি .... ধরে রাখতে পারলেন না।

খ. .... লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।

গ. রাসেল বয়সে .... হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।

ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব .... মনে হচ্ছে।

ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে .... নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিঝুম সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টনটন ময়ূর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচবিঁধা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টনটন করত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ভরে ওঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

২০২০

৭. গল্পে 'টনটন', 'থমথম' এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

ভনভন – চারদিকে মাছি ভনভন করছে।

টনটন – ....

থৈথৈ – ....

রইরই – ....

কনকন – ....

ঝনঝন – ....

৮. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুখ	দুঃখ	মা–বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়।
মায়া	....	....
স্বাদ	....	....
কষ্ট	....	....
নকল	....	....
রানি	....	....
রাজপুত্র	....	....
অসুন্দর	....	....
খুশি	....	....

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

হ্ম – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্ব – পরিপক্ব, ক্বচিৎ

ণ্ড – গণ্ডার, পাষণ্ড

ণ্ট – ঘণ্টা, কণ্টক

অবাক জলপান

সুকুমার রায়

পাত্রগণ : পথিক। ঝুড়িওয়ালা। বৃদ্ধ। ছোকরা। খোকা। মামা।

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে লাঠির আগায় লোটা–বাঁধা পুঁটলি। উস্কখুস্ক চুল। শ্রান্ত চেহারা)

পথিক : নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?

২০২০

গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছি নে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না, না আমি তা বলি নি –

ঝুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেন নি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

ঝুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামাখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন– আমি জল চাচ্ছিলাম–

ঝুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়– 'জলপাই' বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি– তবে জল চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[ঝুড়িওয়ালার প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলিয়া এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃদ্ধ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না– কেবলই সাত-পাঁচ গপ্‌পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃদ্ধ : আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাও নি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিসপুরে চাকরি করে।

সেটা তো একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কী বলবে তোমায়?

পথিক : কী জানি মশাই–জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে–

বৃদ্ধ : হুঁঃ-ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব –

পথিক : না মশাই, গুনিনি–আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই –

বৃদ্ধ : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না-একেবারে অপদার্থের একশেষ।

[বৃদ্ধের সশব্দে জানালা বন্ধকরণ]

[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]

[পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ।]

পথিক : ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা : কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? – (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?

পথিক : আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি-তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

[মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]

মামা : কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

[পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভিতর

[ঘর নানা রকম যন্ত্র, নকশা, রাশি-রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত]

মামা : কী বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি!

মামা : আ হা হা! কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা ক-জনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতকগুলি ছবি, বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কী গুণ –

পথিক : আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি –

মামা : আসছে - ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুইভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন।

পথিক : এই মাটি করেছে!

মামা : বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়–হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনছেন তো?

পথিক : দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি- তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা : শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুড়ে কামড়াল, বদ্যিনাথের হলো হাইড্রোফোবিয়া- যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না–যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিচ ধরে। মহা মুশকিল।

পথিক : নাঃ এদের সঙ্গে পেরে ওঠা গেল না– কেনই মরতে এসেছিলাম এখানে? বলি মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো জল খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা : আছে বইকি! এই দেখুন না বোতল-ভরা টাটকা খাঁটি ডিস্টিল ওয়াটার–যাকে বলে পরিশ্রুত জল।

২০২০

[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক : (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা : না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই– একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল– এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলুম শুনুন– এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোন্তা জল– এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম– ব্যস, গোলাপি রং উড়ে সাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো?

পথিক : না মশাই, কিছু দেখি নি, কিছু বুঝতে পারি নি, কিছু মানি না ও কিছু বিশ্বাস করি না।

মামা : কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না?

পথিক : না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু বিশ্বাস করব না।

২০২০

মামা : বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি– আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

পথিক : তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধ নেই, পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা–টয়লা কিচ্ছু নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে দেখান তো!

মামা : এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি- ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই জলে কী রকম হয়, আর নোংরা জলে কী রকম তফাত হয়, আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ করা]

পথিক : আঃ বাঁচা গেল!

মামা : (চটিয়া) এটা কী রকম হলো মশাই?

পথিক : পরীক্ষা হলো- এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান তো? কীরকম হয়?

মামা : (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?

পথিক : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন– পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন– আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া সে হাঁকিতে লাগিল – ‘অবাক জলপান’]

অনুশীলনী

১. নাটিকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' ছোট্ট একটি নাটিকা। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা– এই চারজন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটিকা। ছোট্ট নাটককে নাটিকা বলে। 'অবাক জলপান' নাটিকার কাহিনি হচ্ছে- ভীষণ তৃষ্ণার্ত একটি লোক তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ত বরকন্দাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট বৃক্ষমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ত	বরকন্দাজ	এক্সপেরিমেন্ট	তেষ্টায়	বৃক্ষমূর্তি	খাটিয়ার

ক. .... বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি .... বলেন?

গ. একটা লোক .... জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশেষে .... ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা .... করে বলা যাবে।

চ. .... লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ‘বোবা জল’ বলতে কী বোঝায়?

খ. ‘জলাতঙ্ক’ কাকে বলে?

গ. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দু জনের কথোপকথন কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ।

ঙ. পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।

চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটিকা লেখ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?

১. নাটিকা	২. ছোটগল্প
৩. প্রবন্ধ	৪. উপন্যাস

খ. পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?

১. কাঁচা আম	২. জল
৩. জলপাই	৪. পাকা আম

গ. কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?

১. ডিপথেরিয়া	২. আমাশয়
৩. জলাতঙ্ক	৪. টাইফয়েড

ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?

১. ৪ জন	২. ৩ জন
৩. ২ জন	৪. ৫ জন

ঙ. বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?

১. পঁচিশ	২. ত্রিশ
৩. দশ	৪. সাতাশ

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?

১. বালক　　২. মামা

৩. ঝুড়িওয়ালা　　৪. বৃদ্ধ

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?

১. ঝুড়িওয়ালা　　২. বৃদ্ধ

৩. বালক　　৪. মামা

৫. কর্ম-অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।

সুকুমার রায়

কবি-পরিচিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখেছেন। 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাইখাই', 'অবাক জলপান' তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হয়েও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিঁড় না নরম পাতা।

শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি—
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়- সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই   কিরণ   ধরা   তারারা   ফোটে   স্নেহ-কণা   রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায়	কিরণ	ধরার	তারারা	স্নেহ–কণা	রূপকথার	ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে .... মাথা।

খ. সকালে সূর্যের .... ততটা তীব্র হয় না।

গ. .... বুকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আঁধার আকাশে .... মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল ....।

চ. .... বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা .... দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

৫. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি–
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

ফুলের নাম:
ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:
কোথায় হয়:
ব্যবহার:
কেন প্রিয় ফুল:

খ. পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কবি-পরিচিতি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। সংগীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

২০২০

মাটির নিচে যে শহর

বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সে সব স্থানের নাম তোমরা হয়তো জান, যেমন– ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর। এগুলো কোনোটি হয়তো তোমরা দেখেও থাকবে। সেগুলো সবই মাটির ওপরে, ঢিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়েছে এক প্রাচীন নগর–সভ্যতা।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

কুমিল্লার লালমাই আর বরেন্দ্র অঞ্চলের পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ের মতো মধুপুর গড়ের অধিকাংশ ভূমির গঠন একই রকম। এ অঞ্চল মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মৃত্তিকা–বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরানো। আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের এই দেশের ভূপৃষ্ঠ ঠিক এই রকম ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে ছয় শতকে বর্তমানের গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য জনমানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। এখনকার নরসিংদী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ পেরিয়ে নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার দক্ষিণ দিক থেকে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

এরপর সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন বা নদীভাঙন হয়েছিল কোনো এক সময়ে। ফলে এসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বড় রকমের ওলটপালট হয়। ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে। ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায়। এখনো তোমরা দেখে থাকো নদীর পাড়ের জমি, ঘরবাড়ি, গ্রাম আর রাস্তা-ঘাট ভাঙছে। আবার বিশাল নদীর অন্য দিকে বিস্তীর্ণ চর পড়ছে। শত শত বছর আগে থেকেই এইভাবে চলে আসতে থাকে ভাঙা-গড়া। মাটিচাপা পড়ে যায় এক একটি নগর-জনপদ। মাটি খুঁড়ে এমনি এক সুপ্রাচীন নগর-জনপদের দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেই স্থানের নাম নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর। উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর বেলাবো ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

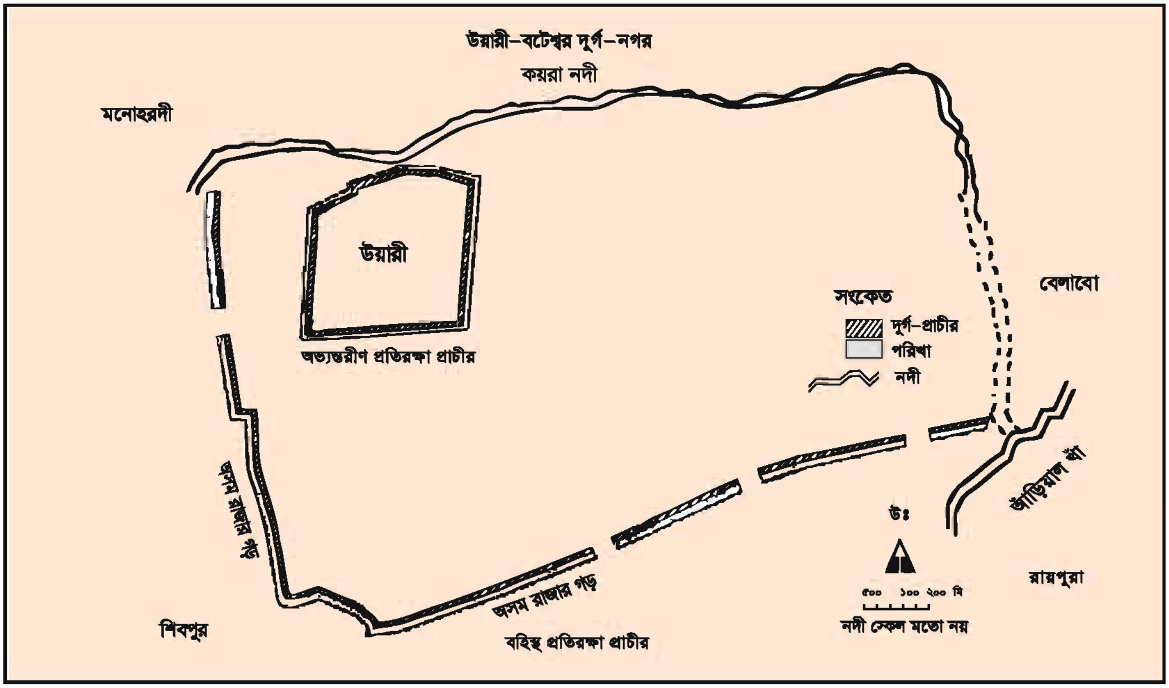

আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিল বঙ্গাদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। সেটাই ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তিনি তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড ফেলে যান। ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারি লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান বাবাকে নিয়ে

দেখান। তিনি অভিভূত হন। ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে মাটি খননকালে ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার একটি ভাণ্ডার পান তিনি। তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেন। পরে তিনি সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন। অনেক পরে ২০০০ সালে এখানে শুরু হয় খনন কাজ। নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর। আরও পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার। মুদ্রাগুলো ভারত উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

সে সময় শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে ভৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী-বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

প্রাচীন মুদ্রা

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম, যেমন-রাঙ্গার টেক, সোনারুতলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গীরাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, জানখাঁরটেক, টঙ্গীরটেকে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের যত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই বলা যায়, এখানকার মানুষ যথেষ্ট সভ্য ছিল। এই স্থানের বসতি এলাকাটি সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, এই প্রত্নতত্ত্ব স্থাপত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে 'সোনাগড়া' নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলা। এখানকার মন্দিরভিটায় এক বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। জানখাঁরটেকে একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আশ্চর্য সব নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপত্যকা জনপদ প্রাচীনতম অভিভূত নিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব ঐতিহাসিক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক	উপত্যকা	অভিভূত	নিদর্শন	প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি .... একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য .... পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের .... নিদর্শন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে ....।

ঙ. আমি জাদুঘর দেখে .... হয়ে গেলাম।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

গ. ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

ঘ. কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

ঙ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

৪. বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ছাপাঙ্কিত–ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর ওপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা। বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা ফুল ছাপাঙ্কিত আছে।

এখানে দুটি শব্দ, ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঙ্কিত। এই রকম দুই শব্দের মিলন হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ= নীলাকাশ ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী–বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?

১. হাসিবুল্লাহ পাঠান   ২. হাফিজুল্লাহ পাঠান
৩. হাবিবুল্লাহ পাঠান   ৪. শরিফুল্লাহ পাঠান

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে–

১. ভাষানটেকে   ২. জানখাঁরটেকে
৩. টেকেরহাটে   ৪. টঙ্গীরটেকে

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

১. বুড়িগঙ্গা   ২. ব্রহ্মপুত্র
৩. শীতলক্ষ্যা   ৪. মেঘনা

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গেছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

১. মধুপুর   ২. ময়নামতি
৩. পাহাড়পুর   ৪. নরসিংদী

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

১. রূপাগড়া   ২. মনগড়া
৩. সোনাগড়া   ৪. সোনাঝুরি

৬. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

কাজী কাদের নওয়াজ

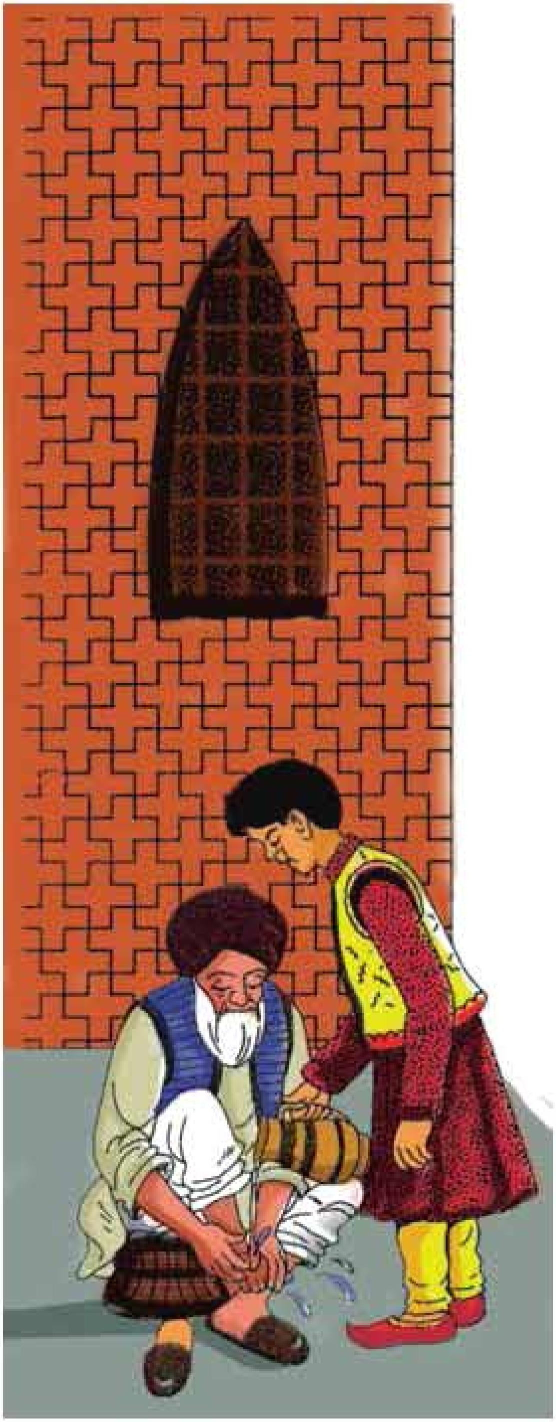

বাদশাহ্ আলমগীর-
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির।
একদা প্রভাতে গিয়া
দেখেন বাদশাহ্– শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া
ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে
পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধুলি
ধুয়ে-মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি।

শিক্ষক মৌলবি
ভাবিলেন, আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝি তাঁর সবি।
দিল্লিপতির পুত্রের করে
লইয়াছে পানি চরণের পরে,
স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে— কোন কালে!
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তাঁর ভালে।

হঠাৎ কী ভাবি উঠি
কহিলেন, আমি ভয় করি নাক, যায় যাবে শির টুটি,
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লির পতি সে তো কোন ছার,
ভয় করি নাক, ধারি নাক ধার, মনে আছে মোর বল,
বাদশাহ্ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল।

যায় যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাণের চেয়েও মান বড়, আমি শুনাব শাহানশাহে।

তার পরদিন প্রাতে
বাদশাহর দূত শিক্ষকে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।
খাস কামরাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

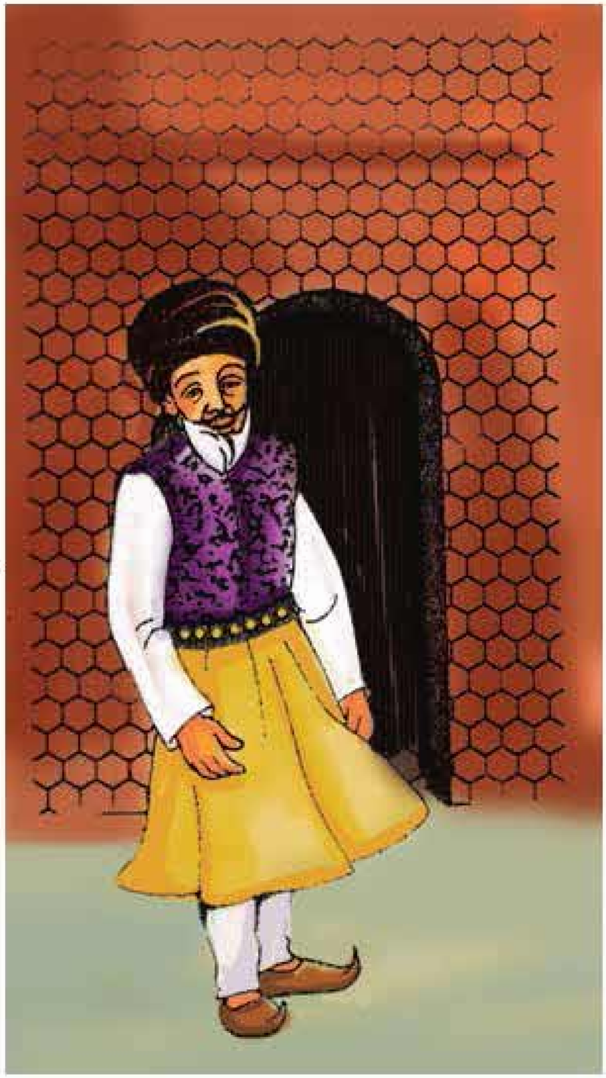

শিক্ষক কন— 'জাঁহাপনা, আমি বুঝিতে পারি নি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমায় ডেকেছেন নিরালায়?'
বাদশাহ কহেন, 'সে দিন প্রভাতে
দেখিলাম আমি দাঁড়ায়ে তফাতে
নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন,
পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ।
নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে
ধুয়ে দিল নাক কেন সে চরণ, বড় ব্যথা পাই মনে।'

উচ্ছ্বাস ভরি শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে,
কুর্ণিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে—
'আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির
সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।'

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবেন। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। বাদশাহ আলমগীর উপলব্ধি করেছিলেন, যে ছাত্র তাঁর শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দিতে জানে না, শিক্ষকের সেবা করতে জানে না, সে কখনো পরিবার, সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাণ্ডারি। তিল তিল করে নীরবে নিভৃতে শিক্ষক তাঁর আদর্শ দ্বারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উপযোগী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন। সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুমার শাহজাদা বারি চরণ শির শাহানশাহ প্রক্ষালন কুর্নিশ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কুমার	বারি	চরণ	শির	শাহানশাহ	কুর্নিশ

ক. পিতার .... হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।

খ. বর্ষাকালে প্রবল .... বর্ষণ হয়।

গ. আগের দিনে হাতি—ঘোড়া চড়ে .... শিকারে যেতেন।

ঘ. উজির বাদশাহকে .... করলেন।

ঙ. .... আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।

চ. অন্যায়ের কাছে কখনো .... নত করব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?

খ. একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?

গ. বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?

ঘ. 'প্রাণের চেয়েও মান বড়'— শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

ঙ. বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?

চ. শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

৬. ক্ষ, স্ব, স্ম, স্ত্র– প্রত্যেকটি যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে তিনটি করে শব্দ লিখি। যেমন–

ক্ষ = ক্ + ষ — ক্ষয়, শিক্ষা, সক্ষম

স্ব = স্ + ব —

স্ম = স্ + ম —

স্ত্র = স্ + ত্ + র —

৭. বিপরীত শব্দগুলো ঠিকমতো সাজাই।

বড়	অপযশ
মান	অবনত
যশ	বিকাল
বিষাদ	অপমান
উন্নত	ছোট
সকাল	হর্ষ

কাজী কাদের নওয়াজ

কবি-পরিচিতি

কবি কাজী কাদের নওয়াজ ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাশ করেন। তিনি চাকরি জীবনের প্রথমে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর, পরে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গীতিকবিতা ও কাহিনিমূলক শিশুতোষ কবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২০

ভাবুক ছেলেটি

দশ-এগারো বছরের ছেলেটি তেমন দুরন্ত নয়। পড়াশোনায় সে ভালো, খেলাধুলাও করে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ-বৃষ্টির ব্যাপারটাও দেখে সে। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিস্ময়ে ভাবে সে। ঝড়ে গাছপালা ভেঙে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে।

– আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙে গেলে, ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না?
ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

ছেলেটির বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তবে তার জন্ম ময়মনসিংহে। ১৮৫৮ সালের ত্রিশে নভেম্বর। ওর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর ময়মনসিংহে স্কুল শিক্ষার ধাপ শেষ করে সে ভর্তি হয় কলকাতায়। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ১৮৭৪ সালে সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। কৃতিত্বের ধারায় সে ১৮৭৮ সালে এফএ পাস করে। তারপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসেবে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করে। তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছ কে তিনি? হ্যাঁ, সেদিনকার সেই ভাবুক ছেলেটিই পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

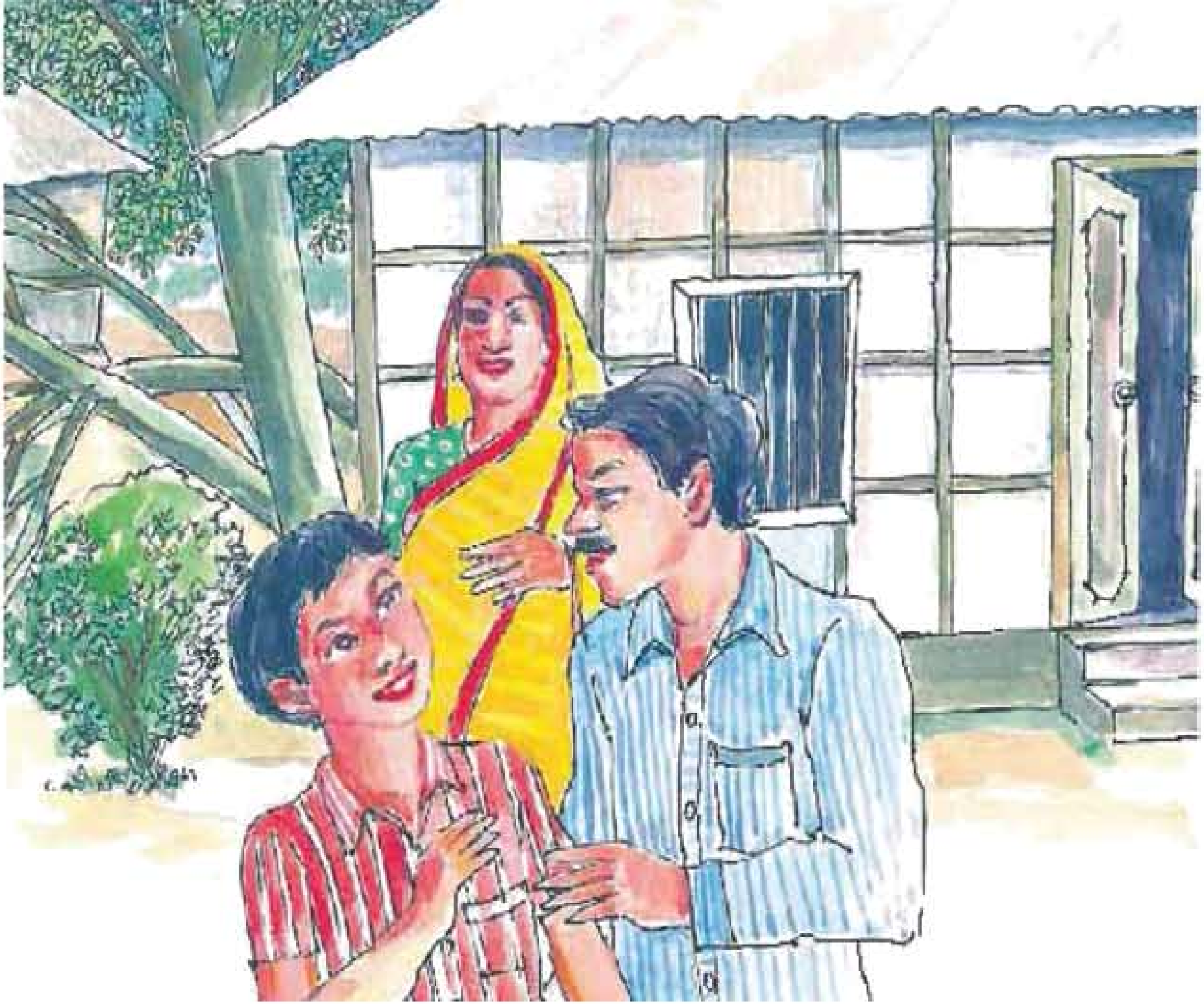

জগদীশচন্দ্র এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তিনি। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন দেশ ছিল পরাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংরেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভারতীয়রা পেতেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্র অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তাঁর বেতন আরও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে তাঁকে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে–এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

জগদীশচন্দ্র বসু

মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন: জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।

জগদীশচন্দ্র বাংলাতেও বেশ লিখেছেন, বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশুদের জন্য। তাঁর লেখা 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। এটি পরে 'পলাতক তুফান' নামে জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়। তাঁর লেখা 'অদৃশ্য আলোক তোমাদের আনন্দ দেবে।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট উপাধি' দেন। তাই তাঁর উপাধিসহ নাম হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে ১৯৩৫ সালে। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের গিরিডিতে মারা যান ১৯৩৭ সালের তেইশে নভেম্বর।

ওই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটিই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বাঙালির গৌরব। সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পর্যবেক্ষণ   পাণ্ডিত্যপূর্ণ   বিজয়স্তম্ভ   গিরিডি   কল্পকাহিনি   বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
প্রবেশিকা   এফএ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিজয়স্তম্ভ	কল্পকাহিনি	আবিষ্কার	কল্যাণ	পাণ্ডিত্যপূর্ণ	দুরন্ত	পদার্থে
পদার্থবিজ্ঞানের	বিস্ময়ে	বাড়িতে	অতিক্ষুদ্র	কর্তব্য	প্রাণী জীবনের	

ক. তাঁর .... বক্তৃতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

খ. দেশের .... করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

গ. জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্চর্য সব .... দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ. জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি .... ।

ঙ. জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরুদ্দেশের কাহিনি' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক .... ।

চ. ছেলেটি তেমন .... নয়।

ছ. মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক .... ভাবে।

জ. ওর পড়াশোনার শুরু .... ।

ঝ. প্রেসিডেন্সি কলেজে .... অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

ঞ. প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে .... পালন করেন।

ট. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদ ও .... মধ্যে অনেক মিল আছে।

ঠ. তিনি .... তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক. ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিলেন?

খ. তিনি ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন?

গ. তিনি কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন?

ঘ. কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?

ঙ. কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

চ. তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?

ছ. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

জ. 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?

ঝ. অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

ঞ. 'তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।' এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

১. গাছের প্রাণ আছে
২. অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
৩. মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে
৪. বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

খ. জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন?

১. বাংলা
২. পদার্থবিজ্ঞান
৩. ইংরেজি
৪. গণিত

গ. জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১. ময়মনসিংহ
২. ঢাকা
৩. কুমিল্লা
৪. ফরিদপুর

ঘ. 'জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ' কথাটি কে বলেছিলেন?

১. বিজ্ঞানী অলিভার লজ
২. বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন
৩. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন
৪. বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষার ধাপ পার	প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়–এর শিক্ষা হলো একটার পর একটা শিক্ষার ধাপ।
বকেয়া পরিশোধ	কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।
অন্যতম	বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য ‘অন্যতম’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়।
তথ্যের আদান–প্রদান	তথ্য বলতে ঠিক সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার, টেলিভিশন, ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।
নাইট উপাধি	নাইট উপাধি ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করা হয়।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিজ্ঞান শিক্ষাই সভ্যতা বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার’ – বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখি।

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধেবেলায় ভিড়ে।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।

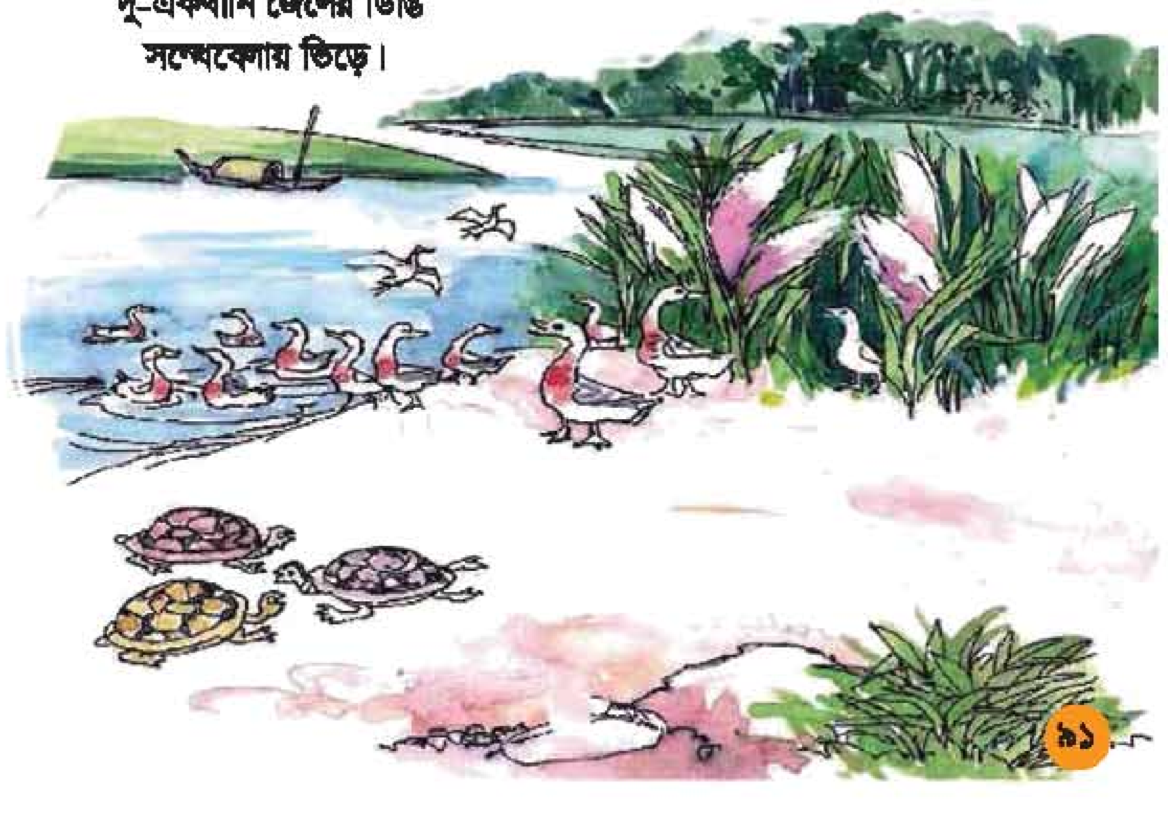

২০২০

সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

(সংক্ষেপিত)

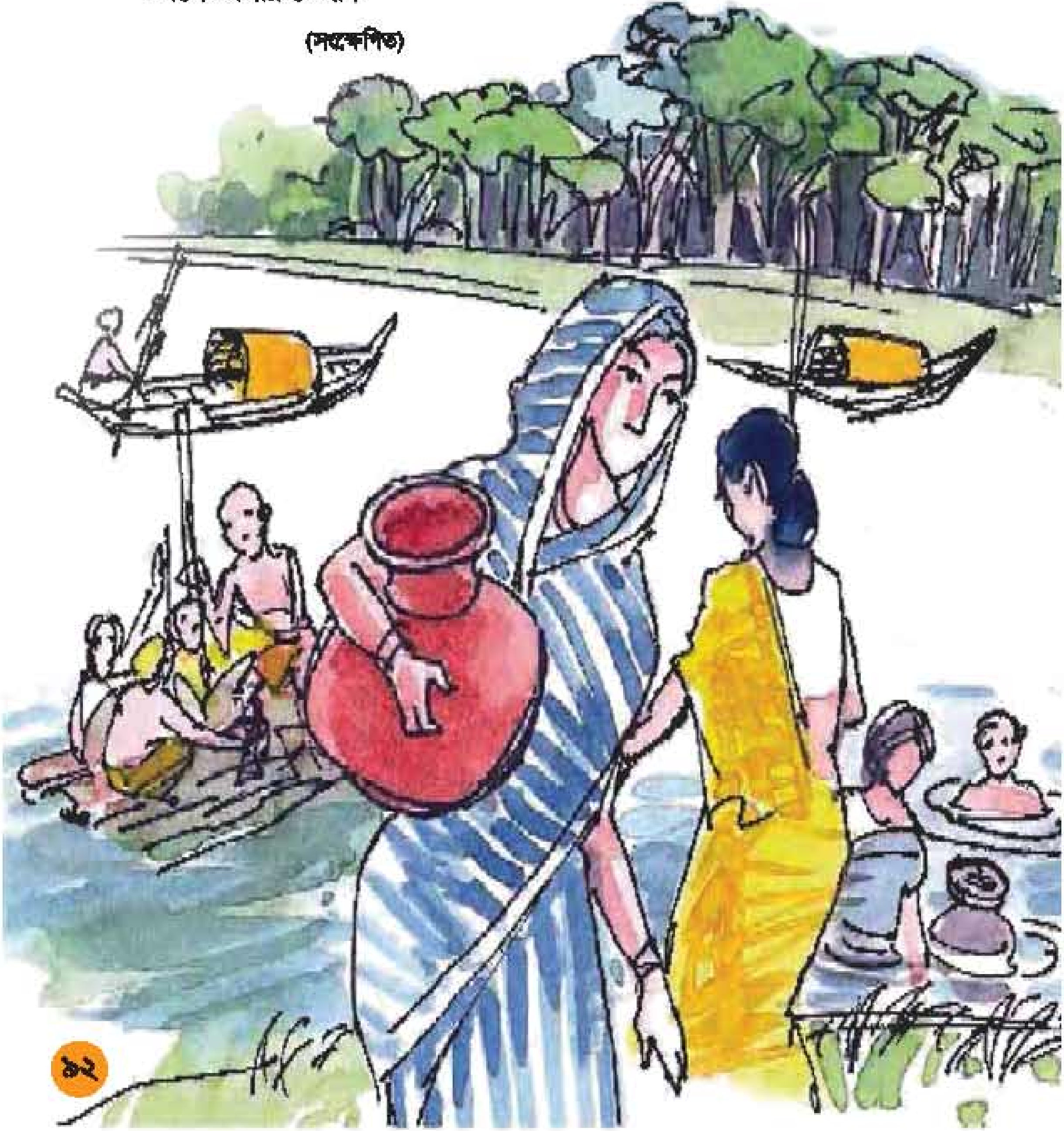

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকাচকিরা যেখানে ঘর বাঁধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভিড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। একটি নদী দুই তীরের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্জন   চকাচকি   তট   ডিঙি   আচ্ছাদন   বেণুবন

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকাচকিরা	আচ্ছাদন	তটে	বেণুবন	নির্জন	ডিঙি

ক. এলাকাটি এত .... যে গা ছমছম করে।

খ. নদীর ধারে .... দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়।

গ. গ্রামের ছোট ছোট নদীগুলো দিয়ে মানুষ .... করে নদী পারাপার হয়।

ঘ. নদীর দু .... প্রতিবছর মেলা বসে।

ঙ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ .... হিসাবে ব্যবহার করে।

চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা .... বাতাসে দুলতে থাকে।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নদীর বালুচরে কী ঘটে?

খ. দুই তীরে দু-জন মানুষের ভালো লাগার জিনিসগুলো কী?

গ. ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ. দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?

ঙ. সকাল-সন্ধেবেলা ছেলের দল কী করে?

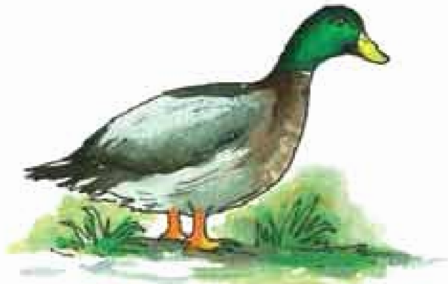

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

.... মাস,

.... বাঁশ।

.... চর,

.... ঘর।

.... মন,

.... বন।

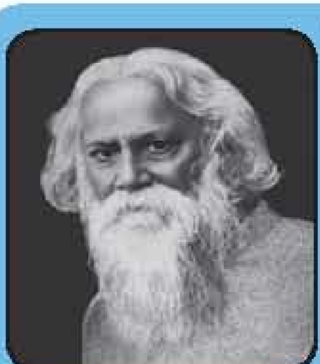

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাংলা সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভাণ্ডার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাংলা সনের ২২শে শ্রাবণ, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

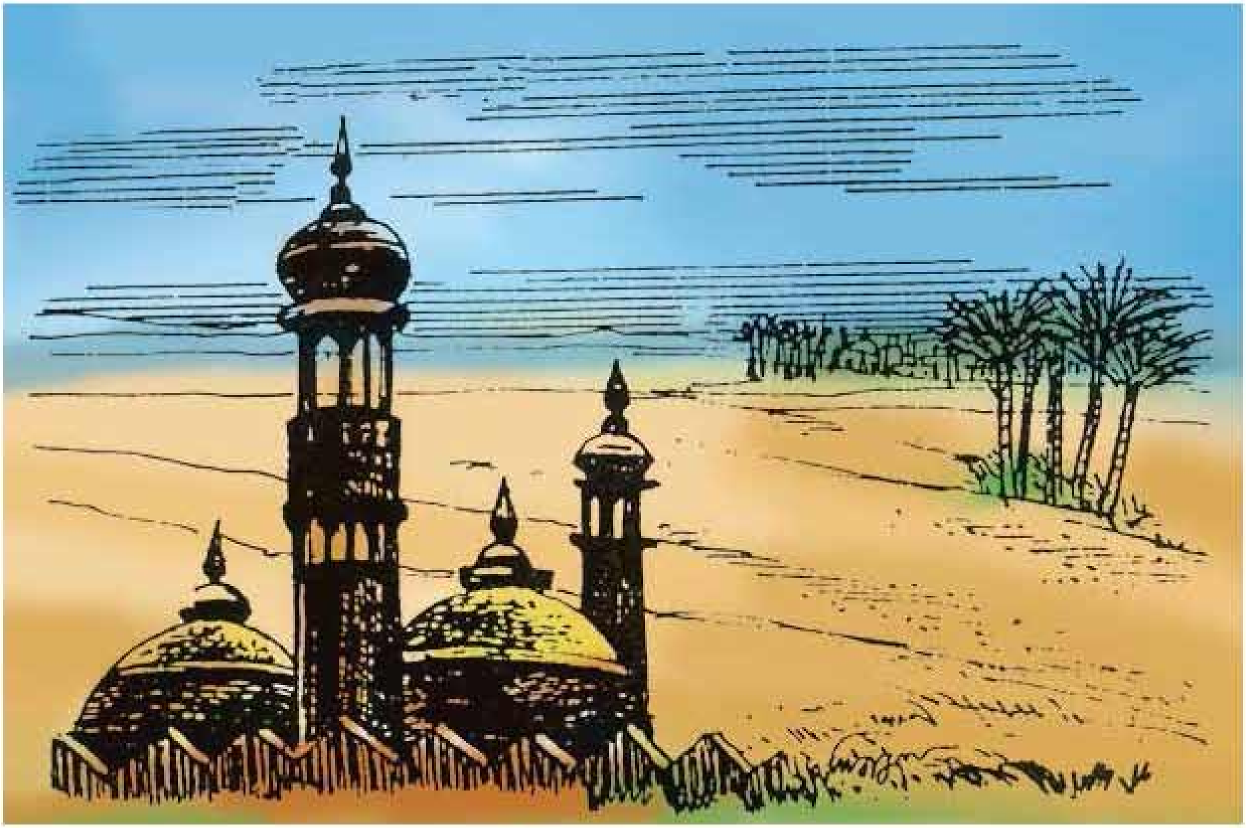

বিদায় হজ

দশম হিজরি। আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী। ইসলামের এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তরের গভীরে কাবার আহ্বান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করবেন। এই সংবাদ চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

যিলকাদ মাস। নবিজির (স) কাছে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে হজ পালন করবেন। যিলকাদ মাসের শেষ দিকে মহানবির (স) সঙ্গে তাঁরা মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে এক বার দেখার জন্য কাবাশরিফে এলেন।

আরব দেশের নানা স্থান থেকে সেবার প্রায় দুই লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন। আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। আর তাই এটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। আজকের এই দিন তোমাদের কাছে পবিত্র। এ মাসটিও তেমনি তোমাদের কাছে পবিত্র। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরস্পরের কাছে পবিত্র।

মনে রেখ, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।

তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে।

কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

মনে রেখ, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমরা এক ভাই কখনও অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল কর না।

কখনও অন্যায় এবং অবিচার কর না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আজ যারা এখানে আসে নি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়ত এই উপদেশ তারা বেশি করে মনে রাখবে।

মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না।

মহানবি জোর দিয়ে বললেন :

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না।

মহানবি (স) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন। এই চারটি কথা হলো :

- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা কর না।
- অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা কর না।
- পরের সম্পদ অপহরণ কর না।
- কারও ওপর অত্যাচার কর না।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আরও বললেন :

তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি।

এক. আল্লাহ্র বাণী অর্থাৎ কুরআন।

দুই. আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ রাসুলের জীবনের আদর্শ। এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

মহানবি (স) তার ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্, আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি?"

আরাফাতের ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, "হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।"

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)- এর মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তাঁর মনে হলো, হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ। হয়ত তিনি আর কাবাশরিফে উপস্থিত হতে পারবেন না। সমবেত মানুষের উদ্দেশে তিনি বললেন, "তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়!"

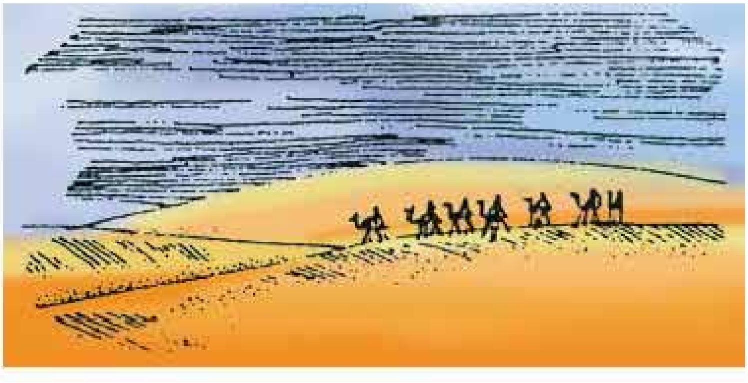

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

হিজরি হজ মহানবি কাবাশরিফ আরাফাত ভাষণ বান্দা আমির উপাসনা ক্রীতদাস যিলকাদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আরাফাত	ক্রীতদাস	কাবাশরিফ	মহানবি	হিজরি	হজ

ক. দশম .... হজের সময় এসে গেল।

খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে .... পালন করবেন।

গ. .... হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য .... এলেন।

ঙ. .... ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।'

চ. কোনো .... যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?

খ. আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

গ. মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?

ঘ. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?

ঙ. কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?

চ. তিনি আমাদের কাছে কোন দুইটি জিনিস রেখে গেছেন?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিই।

ক. বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

১. মদিনায় ২. মক্কায়

৩. আরাফাতের ময়দানে ৪. জেদ্দায়

খ. আরাফাতের ময়দানে কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন?

১. প্রায় এক লক্ষ
২. প্রায় দুই লক্ষ
৩. প্রায় তিন লক্ষ
৪. প্রায় চার লক্ষ

গ. হযরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?

১. সৈন্যদের
২. সাহাবিদের
৩. আলেমদের
৪. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের

ঘ. মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?

১. দুইটি
২. চারটি
৩. ছয়টি
৪. আটটি

ঙ. মহানবির (স) চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?

১. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য
২. মক্কা জয়ের আনন্দে
৩. সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায়
৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

৫. নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করি।

যার তুলনা হয় না — অতুলনীয়
যার শত্রু জন্মায় নি — অজাতশত্রু
আকাশে যে উড়ে বেড়ায় — খেচর
বিদেশে থাকে যে — প্রবাসী
যা কষ্টে লাভ করা যায় — দুর্লভ
যা জলে চরে — জলচর

৬. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	।
জিজ্ঞাসা-চিহ্ন	?
বিস্ময়-চিহ্ন	!

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল এত মানুষ এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাঁর মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

'বিদায় হজ' রচনাটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লিখ।

দেখে এলাম নায়াগ্রা

তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। সেখানকার খুব বড় শহর টরন্টোতে। একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল–সবাই মিলে নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়। তখনি সকলে রাজি। কোনদিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

কোথাও যাব বললেই তো হয় না, কীভাবে যাব তা ভাবতে হয়। বাসে করে যাওয়া যায়। কিন্তু বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে থামা যায় না। অতএব ঠিক হলো যে, কোনো বন্ধুর একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।

তাই যাওয়া গেল একদিন। আমেরিকায় কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে। আমার বন্ধুরও ছিল। বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

শাঁ শাঁ করে গাড়ি ছুটতে লাগল। এখানে রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা থাকে না, রেললাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াগ্রা দেখতেই যেতে হবে কেন? নায়াগ্রা হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখি নি। শুধু জেনে এসেছি, ঝর্ণার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গড়িয়ে পড়ে। তবে আকারে অনেক বিশাল। ঝর্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড়– এটুকু যা তফাত। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দুই জায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না-ই পড়ে, তা হলে ঝর্ণাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছেটা কোথায়? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। ঝর্ণার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না– একি কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেয়ে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপায় তো নেই।

কিন্তু বিশ্ব-ভূমন্ডল বড়ই বিচিত্র! কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না! তার কারণ, যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। দুই দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়?

নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কানাডা   দ্রুতগতিতে   পতন   সমতল ভূমি   প্রবাহিত হওয়া   গহ্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানাডা	দ্রুতগতিতে	পতন	সমতল ভূমিতে	প্রবাহিত	গহ্বর

ক. হোঁচট খেলে .... ঠেকানো দায়।

খ. নদীর জল .... হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

গ. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা .... বলি।

ঘ. আমরা .... হাঁটতে পারি।

ঙ. .... একটি বড় দেশ।

চ. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে ...., কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সে রকম নয়।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?

গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?

ঘ. নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?

ঙ. 'বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র'– ব্যাখ্যা কর।

চ. সাধারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

১. জাপান ২. ভারত

৩. কানাডা ৪. রাশিয়া

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে–

১. পাহাড় থেকে ২. সমতল ভূমি থেকে

৩. কোন উঁচু স্থান থেকে ৪. পাহাড়ি ঢল থেকে

গ. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?

১. বাসের ভাড়া বেশি ২. সেখানে বাস যায় না

৩. বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না ৪. বাসে সময় বেশি লাগে

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. তখন আমিও পড়েছি .... জলপ্রপাতের কথা। — সৌভাগ্য

খ. জলপ্রপাত দেখার .... একবার হয়েছিল। — ফাটল

গ. একদিন .... সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠলো। — খরস্রোতা

ঘ. যে মাটির ওপর দিয়ে এই .... নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল.......................। — নায়াগ্রা

কন্ধুবান্ধবদের

২০১০

৬. কথাগুলো বুঝে নিই।

জলপ্রপাত	– পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া।
মজলিস	– গল্পগুজব করার আসর।
জলের ধর্ম	– জলের স্বভাব, জলের চরিত্র।
বিশ্ব-ভূমণ্ডল	– জগৎ, দুনিয়া।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ঘুরতে গিয়েছি- তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে ফিরে এসেছিলাম)।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে নি। সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোতা নদী বইছে। যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

ক. পৃথিবীর বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?
খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?
গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?
ঘ. নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

রৌদ্র লেখে জয়

শামসুর রাহমান

বর্গি এলো খাজনা নিতে,
মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর, পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত।

হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তিসেনা,
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

আবার দেখি নীল আকাশে
পায়রা মেলে পাখা:
মা হয়ে যায় দেশের মাটি,
তার বুকেতেই থাকা।

কাল যেখানে আঁধার ছিল
আজ সেখানে আলো।
কাল যেখানে মন্দ ছিল,
আজ সেখানে ভালো।

কাল যেখানে পরাজয়ের
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে
রৌদ্র লেখে জয়।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংগ্রাম করেছিল সে কথাও বলা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বর্গি   হানাদার   খাজনা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হানাদারদের	বর্গি	খাজনা

ক. সরকারকে .... দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।

খ. বহু পূর্বে বাংলায় .... এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।

গ. .... পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. বর্গি এলো খাজনা নিতে, মারল মানুষ কত।	'খাজনা নিতে' অর্থ লুটতরাজ করত। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।
খ. তাদের কথা দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।	মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তাঁরাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন।
গ. মা হয়ে যায় দেশের মাটি, তার বুকেতেই থাকা।	মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

২০২০

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক. বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?
খ. হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?
ঘ. মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?
ঙ. 'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'– কথাটি ব্যাখ্যা করি।

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আঁধার	আলো	কালো	সাদা	ভালো	মন্দ	জয়	পরাজয়	সকাল	সন্ধ্যা

ক. বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজ দলের .... দেখে ছেলেটি আনন্দে নেচে উঠলো।

খ. একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা .... ব্যাজপরে শহিদ মিনারে যাই।

গ. .... হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।

ঘ. .... নামলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।

ঙ. .... ছেলের সঙ্গ ত্যাগ করাই উত্তম।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

শামসুর রাহমান

কবি-পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবরে পুরানো ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার পাড়াতলী গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো', 'স্মৃতির শহর ঢাকা' ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

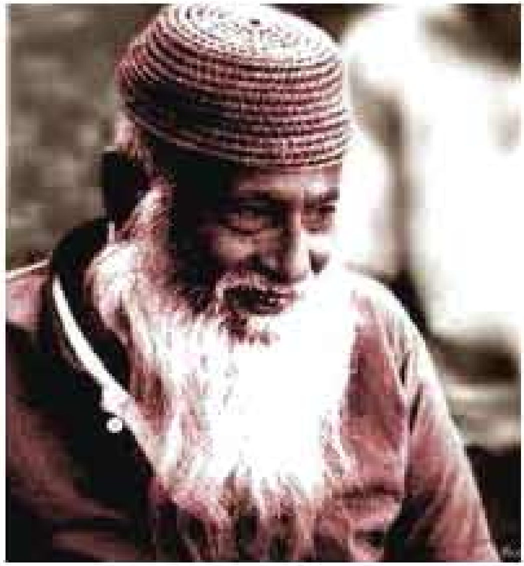

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বাংলার কৃষক-মজুর-শ্রমিকের অতি আপনজন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মজলুম মানুষের সুখে-দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন। সংগ্রাম করেছেন। এজন্য তিনি মজলুম জননেতা।

সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবার। এ পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবার নাম হাজী শরাফত আলী খান। মায়ের নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁর এক চাচা ইব্রাহীম খান তাঁকে শৈশবে আশ্রয় দেন। এই চাচার কাছ থেকেই তিনি মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এ সময় তিনি ইরাক থেকে আগত এক পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। এ সময় তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারির এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানে শিক্ষকতার সময় তিনি জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। ফলে জমিদারের বিষ-নজরে পড়ে তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

বাইশ বছর বয়সে কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। পরে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। এরপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। সতেরো মাস পর তিনি মুক্তি পান। এরপর ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে তিনি এক সভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি কৃষক সাধারণের ওপর জমিদারদের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরেন। এই সভায় ভাষণের জন্য তাঁকে নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হয়। তিনি এবার চলে যান আসামের জলেশ্বরে। এ বছরই আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে তিনি এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই সমাবেশেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে ভাসানচরের মওলানা নাম

দেয়। পরে তাঁকে ভাসানী নাম দেয়। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী এদেশে একটি প্রিয় নাম।

মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, 'আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি। এই মানুষেরা কাজ করে খেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কারখানায়। এরা কৃষক, এরা শ্রমিক। আর এরাই জমিদার, মহাজন, মালিকের জুলুমের শিকার হয়।'

মূলত সারা জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বাস করতে শুরু করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন 'কাগমারি সম্মেলন' নামে খ্যাত। সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন।

মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন। এই ভাষণে শোষণের এই কথাটিই বারবার উচ্চারণ করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন— পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে, এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পরও কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন করেন।

মওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেন নি। কিন্তু এ দেশের মানুষের শিক্ষা প্রসারে তাঁর অনেক অবদান ছিল । তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবনাচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার। এরকম অনাড়ম্বর জীবনযাপন খুব কম দেখা যায়।

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৯৬ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটে। তাঁকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার শিক্ষা পাই। তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম বিষ-নজর কারারুদ্ধ প্রতিবাদী সমাবেশ
কাগমারি সম্মেলন প্রবাসী আত্মসমর্পণ মোহ অনাড়ম্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবাসী	আত্মসমর্পণ	মোহ	সরকার	প্রতিবাদী

ক. যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ .... হয়ে উঠেছিল।

খ. আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আনিস সাহেব .... ।

গ. .... ছাড়া দেশ চালানো মুশকিল।

ঘ. সৎলোকের ধনসম্পত্তির উপরে .... থাকে না।

ঙ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর .... করে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?
খ. মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?
গ. কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?
ঘ. কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?
ঙ. পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?
চ. শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?
ছ. মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মজলুম কারারুদ্ধ প্রতিবাদ অনাড়ম্বর মোহ আত্মসমর্পণ নিপীড়িত

৫. জেনে নেই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ– ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানান।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?

১. নির্যাতিত　　২. অবহেলিত

৩. সুখী　　৪. বড়লোক

খ. মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?

১. ইরাকের　　২. বাংলাদেশের

৩. ভারতের　　৪. পাকিস্তানের

গ. তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?

১. গ্রামের মানুষের কারণে　　২. জমিদারদের কারণে

৩. ব্যবসায়ীদের কারণে　　৪. রাজনৈতিক কারণে

ঘ. মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন –

১. আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি

২. আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি

৩. আমি সুখী মানুষের কথা বলি

৪. আমি ভালো মানুষের কথা বলি

ঙ. মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–

১. যুক্তফ্রন্ট ২. যুক্তদল

৩. যুবদল ৪. যুবফ্রন্ট

চ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের কী ছিলেন?

১. সদস্য ২. প্রেসিডেন্ট

৩. সহকারী ৪. কেউ নন

ছ. তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?

১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক ৪. শেখ মুজিবুর রহমান

৭. বাক্যের সাথে মিল করে ঠিক শব্দের উপর টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন–মওলানা ভাসানী/শেরে বাংলা/ শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হওয়ার পর মুক্তি পান–তেরো/ পনেরো/ সতেরো মাস পরে

গ. তাঁকে ভাসানী নাম দেয়–ভাসানচরের/ কাগমারীর/ ঢাকার সমাবেশের পর

ঘ. মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা–পুড়িয়ে দেয়/ পাহারা দেয়/ তাদের দখলে নিয়ে নেয়

শহিদ তিতুমীর

তেতো, তিতু, তিতুমীর। শুনতে বেশ অবাক লাগছে, তাই না? তা হলে খুলেই বলি।

১৭৮২ সাল। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলা। সে জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম চাঁদপুর (মতান্তরে হায়দারপুর)। এ গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার। সৈয়দ বংশ। এই বংশে জন্ম নেয় এক শিশু। ছোট্ট শিশুটি ছিল যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বলিষ্ঠ তার গড়ন। শিশুটি ছিল খুব জেদি। শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুখ হলো। রোগ সারানোর জন্য তাকে দেওয়া হলো ভীষণ তেতো ওষুধ। এমন তেতো ওষুধ শিশু তো দূরের কথা বুড়োরাও মুখে নেবে না। অথচ এই ছোট্ট শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে ওষুধ। প্রায় দশ-বারোদিন এই তেতো ওষুধ খেল সে। বাড়ির লোকজন সবাই অবাক। এ কেমন শিশু, তেতো খেতে তার আনন্দ! এ জন্যে ওর ডাক নাম রাখা হলো তেতো। তেতো থেকে তিতু। তার সাথে মীর লাগিয়ে হলো তিতুমীর। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী।

তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। চলছে ব্রিটিশ রাজত্ব। ইংরেজরা চালাত অত্যাচার। অন্যদিকে ছিল দেশি জমিদারদের জুলুম। ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারুণ দাপটে। তিতুমীর এসব দেখতেন আর ভাবতেন, এদের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে দেশের মানুষ।

ফর্মা-১৫

তিতুমীরের গ্রামে ছিল একটি মাদরাসা। সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক হাফেজ। নাম হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ। তিতুমীর এ মাদরাসায় পড়তেন। তিনি অল্প সময়েই হাফেজ নেয়ামত উল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

সেকালে গ্রামে গ্রামে ডনকুস্তি আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো। শেখানো হতো মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর অসিচালনা। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানোর জন্য গায়ে শক্তি সঞ্চয় করা। তিনি ডনকুস্তি শিখে কুস্তিগির ও পালোয়ান হিসেবে নাম করলেন। লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর অসি পরিচালনাও শিখলেন। তাঁর অনেক ভক্তও জুটে গেল। তিতুমীরের গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত ও ধীর স্বভাবের।

একবার ওস্তাদের সঙ্গে তিনি বিহার সফরে বেরোলেন। মানুষের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে দেশকে স্বাধীন করবার চিন্তা এলো। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন। আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। হিন্দু-মুসলমান সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিলেন।

১৮২২ সাল। তিতুমীরের বয়স তখন চল্লিশ। তিনি হজ পালন করতে গেলেন মক্কায়। সেখানে পরিচয় হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ এবং ধর্মপ্রাণ। তিতুমীর তাঁর শিষ্য হলেন। দেশে ফিরে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। ডাক দিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে, নীলকরদের রুখতে আর নিজেদের সংগঠিত হতে। কিন্তু প্রথম বাধা পেলেন জমিদারদের কাছ থেকে। তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হলো। নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি গেলেন বারাসাতের নারকেলবাড়িয়ায়। নারকেলবাড়িয়ার লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ। এটাই নারকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা'। তাঁর এ কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল চার-পাঁচ হাজার। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া আর ফরিদপুর জেলা তখন তাঁর দখলে। ইংরেজদের কোনো কর্তৃত্ব রইল না এসব অঞ্চলে। এ দুর্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের লড়াইয়ের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও প্রস্তুতি শেখাতে লাগলেন। এ খবর চলে গেল ইংরেজ শাসকদের কাছে। ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাল দেশি জমিদাররা। ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয় তিতুমীরকে দমন করবার জন্য। কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁর সিপাহি বাহিনী নিয়ে পরাস্ত হন তিতুমীরের হাতে। তারপর তিতুমীর কয়েকটি নীলকুঠি দখল করে নেন।

১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি পাঠালেন বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী। এর নেতৃত্ব দেওয়া হলো সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে। স্টুয়ার্ড আক্রমণ করলেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তখন ভালো করে ভোর হয়নি। আবছা আলো। স্টুয়ার্ডের ছিল হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য আর অজস্র গোলাবারুদ। তিতুমীরের ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তাঁর না ছিল কামান, না ছিল গোলাবারুদ, বন্দুক। তবে তাঁদের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার অমিত তেজ।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। শহিদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল। কারো হলো কারাদণ্ড, কারো হলো ফাঁসি। এভাবেই শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

জেদি পরাধীন দাপটে ডনকুস্তি অসিচালনা দুর্ভেদ্য দুর্গ বাঁশের কেল্লা
শায়েস্তা অমিত তেজ মুক্তিকামী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরাধীন	ডনকুস্তি	অসিচালনা	দুর্গ	দাপটে	মুক্তিকামী

ক. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল .... ।
খ. ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারুণ .... ।
গ. তিনি লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর .... শিখলেন।
ঘ. সেকালে গ্রামে গ্রামে .... আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো।
ঙ. শহিদ হলেন অসংখ্য .... বীর সৈনিক।
চ. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাঁশের .... ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. 'তিতুমীর' নামটি কেমন করে হলো? তাঁর প্রকৃত নাম কী?

খ. এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্তা কেন তাঁর মনে এলো?

গ. হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবদ্ধ করতে চাইলেন?

ঘ. ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত?

ঙ. নারকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?

চ. কত খ্রিষ্টাব্দে তিতুমীরের কাছে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হয়?

ছ. কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়?

জ. তিতুমীর কীভাবে শহিদ হলেন?

ঝ. পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে?

ঞ. শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

বাঁশের কেল্লা   জেদি   সশস্ত্র   শায়েস্তা   প্রিয়পাত্র   দুর্ভেদ্য

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিই।

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২. সৈয়দ মীর নিসার আলী
৩. মোঃ শামসুল হক
৪. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?

১. ফরাসিদের   ২. ডাচদের
৩. ব্রিটিশদের   ৪. পর্তুগিজদের

গ. মক্কায় কোন সংগ্রামী পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে তিতুমীরের পরিচয় হয়েছিল?

১. হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে
২. হাফেজ নেয়ামত উল্লার সঙ্গে
৩. গোলাম মাসুদের সঙ্গে
৪. হযরত আলী (রা) এর সঙ্গে

ঘ. তিতুমীরের দুর্গের নাম কী?

১. লাঠির কেল্লা — ২. লোহার কেল্লা

৩. বেতের কেল্লা — ৪. বাঁশের কেল্লা

ঙ. তিতুমীর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরাজিত করেন?

১. ১৮২২ — ২. ১৮৩০

৩. ১৮৩১ — ৪. ১৮৩৪

চ. তিতুমীর ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কেন?

১. তাঁর সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে

২. প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবে

৩. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে

৪. অদূরদর্শিতার কারণে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

পরাধীন	স্বাধীন	বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
তেতো	----------------	--
পরাস্ত	----------------	--
দুর্বল	----------------	--
আনন্দ	----------------	--
শান্ত	----------------	--

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শহিদ তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' সম্পর্কে যা জান লিখ।

অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

ঝুমা আর ঝুবা দুই বোন। ওদের খুব ভাব। একসঙ্গে স্কুলে যায়। একসঙ্গে খেলে। খুব কমই ঝগড়া হয় ওদের।

ঝুমার বয়স বারো আর ঝুবার দশ।

দুই জনের জন্মদিন নিয়ে ওদের মা-বাবার এক একটি গল্প আছে। ওদের মা রাহেলা বলে, যেদিন ঝুমার জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল নাকি আর কখনো দেখে নি রাহেলা বানু। খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে।

ঝুবা উদগ্রীব হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

তোর গল্পটা আমি বলব, মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। বলে, যেদিন তুই হলি সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটার নিচে বসে আছি। হঠাৎ মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি আমের বোলে ভরে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখি নি আগে। বোলের গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

দুই বোন মা-বাবার আদরের ছায়ায় বড় হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে। ফড়িং ধরে। আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাতার ভিতর চাপা দিয়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে বাবার কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। মায়ের কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

জসীম মিয়া ওদের কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ, মা। চাইলে লেখাপড়ার জন্য তোদের আমি ঢাকা পাঠাব।

দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়। মা-বাবা ওদের উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন জসীম মিয়া বাজারে যায়। সেখান থেকে দুই সের চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়ে। ছুটে আসে রাহেলা বানু।

– কী হয়েছে?

– যুদ্ধ।

– যুদ্ধ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে।

কিছু বলার আগেই জসীম শুনতে পায় বাইরে হইচই। ও দুই মেয়ের হাত ধরে বাইরে আসে। দেখে লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে। বিবিসির খবরে বলছে, ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

লোকজন খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে।

রুমা-রুবা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয়। চিৎকার করে বলে, যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

কয়েকমাস পরে গাঁয়ে মিলিটারি আসে। জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে রাইফেল চালানো শিখে নেয়। তারপর গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। রাহেলা মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে থাকবে। জসীম চেয়েছিল রাহেলা ওর বাবার বাড়ি চলে যাক, কিন্তু রাহেলা যেতে রাজি হয় নি।

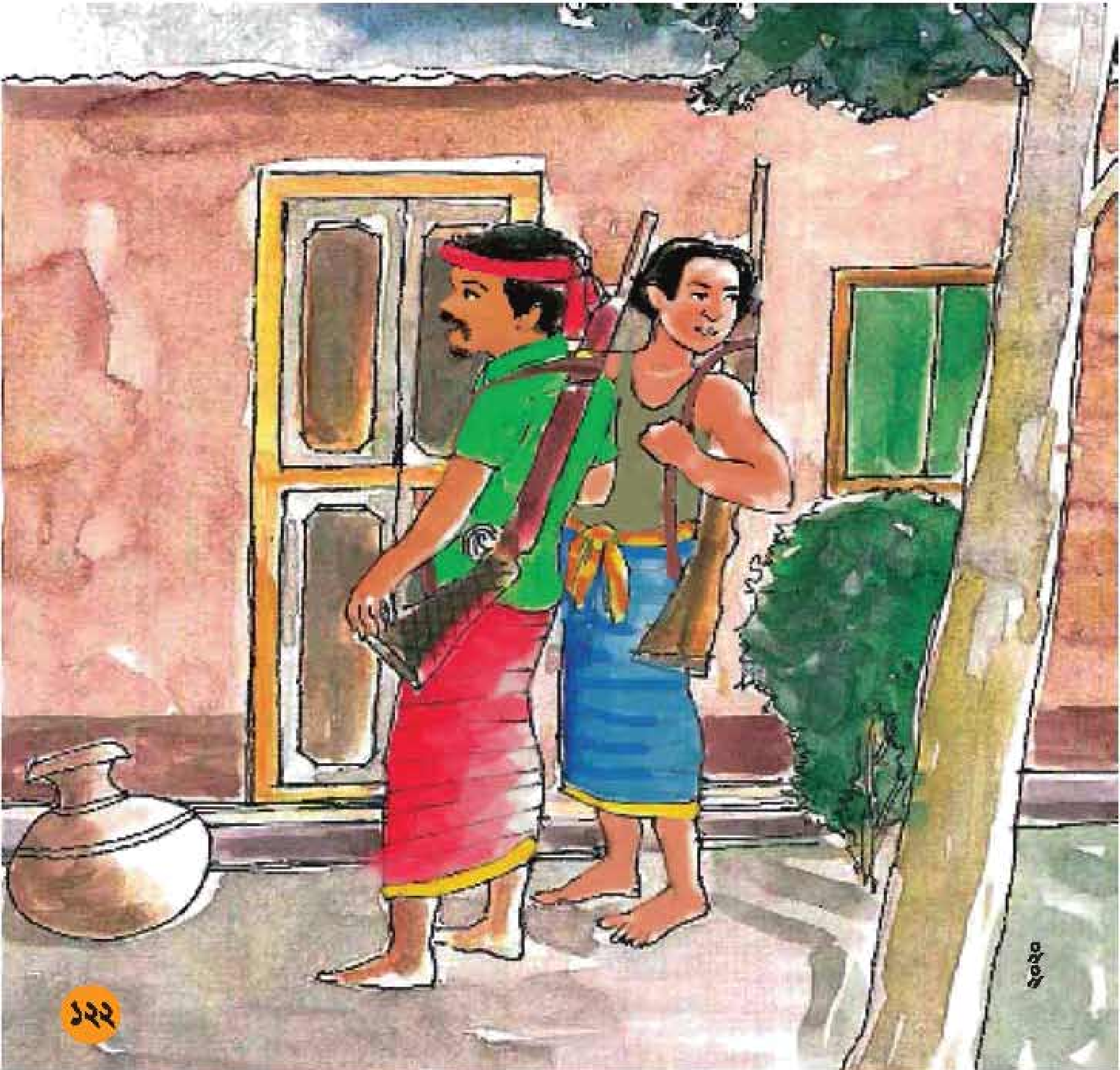

নদীর ধারেই বাজার। সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে পড়ে যায় জসীম। ওরা বাজারের দোকান ও ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে। একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও। রক্তে ভেসে যায় মাটি। নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর।

মিলিটারিরা চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে। রাহেলাও মেয়েদের নিয়ে আসে বাড়িতে। অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন লাগে নি। বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে পারে নি।

রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। রুমা-রুবা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে। রুমা-রুবা কিছুক্ষণ বাবাকে দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভুলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দুই বোন রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।

রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু?

রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া।

দুই জন আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোঁয়ার মতো কিছু একটা আকাশের দিকে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই।

ওরা বুঝতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি।

দুই বোন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুই জনেই বুঝতে পারে যুদ্ধ মানে কী!

ঘোর বর্ষা। বৃষ্টির তোড়ে ডুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে। ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে।

দু-মুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে। দুই বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখে। যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা? দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে।

সে রাতে বৃষ্টি ছিল না। জ্যোৎস্নায় ভরা ছিল উঠোন।

গভীর রাতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে।

চুপিচুপি ডাকে, মা দরজা খোল মাগো–

রুবা ধড়মড়িয়ে উঠে রুমাকে ডাকে। ও ঠেলে মাকে জাগায়।

– মা ওঠো। শোন, কেউ এসেছে। রাহেলা বানু দরজায় টুকটুক শব্দ শোনে। দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা দরজা খোল।

রাহেলা কাঁপা হাতে দরজা খুললে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ওদের একজন বলে, ট্রেনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে যেন আপনার কাছে আসি।

– মা, আপনি আমাদের চিনবেন না। আমাদের খিদে পেয়েছে। ভাত খেয়েই চলে যাব।

– কোথায় যাবে? রুমা জিজ্ঞেস করে।

– নদীর ওপারে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে।

– তোমরা যুদ্ধ করবে? রুবা জানতে চায়।

– হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব।

– তোমাদের রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গভীর আবেগে বলে।

– হ্যাঁ, দেখ।

দুজনে দুবোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো ওরা কোলে নিয়ে বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে। সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি। যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে, তোমরা আবার আসবে তো?

দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যেরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে।
রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।

বর্ষা শেষ।

আশ্বিনের শিউলি ফোটার দিন শুরু হয়েছে। একদিন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়।

— খুকুমণিরা দরজা খোল।

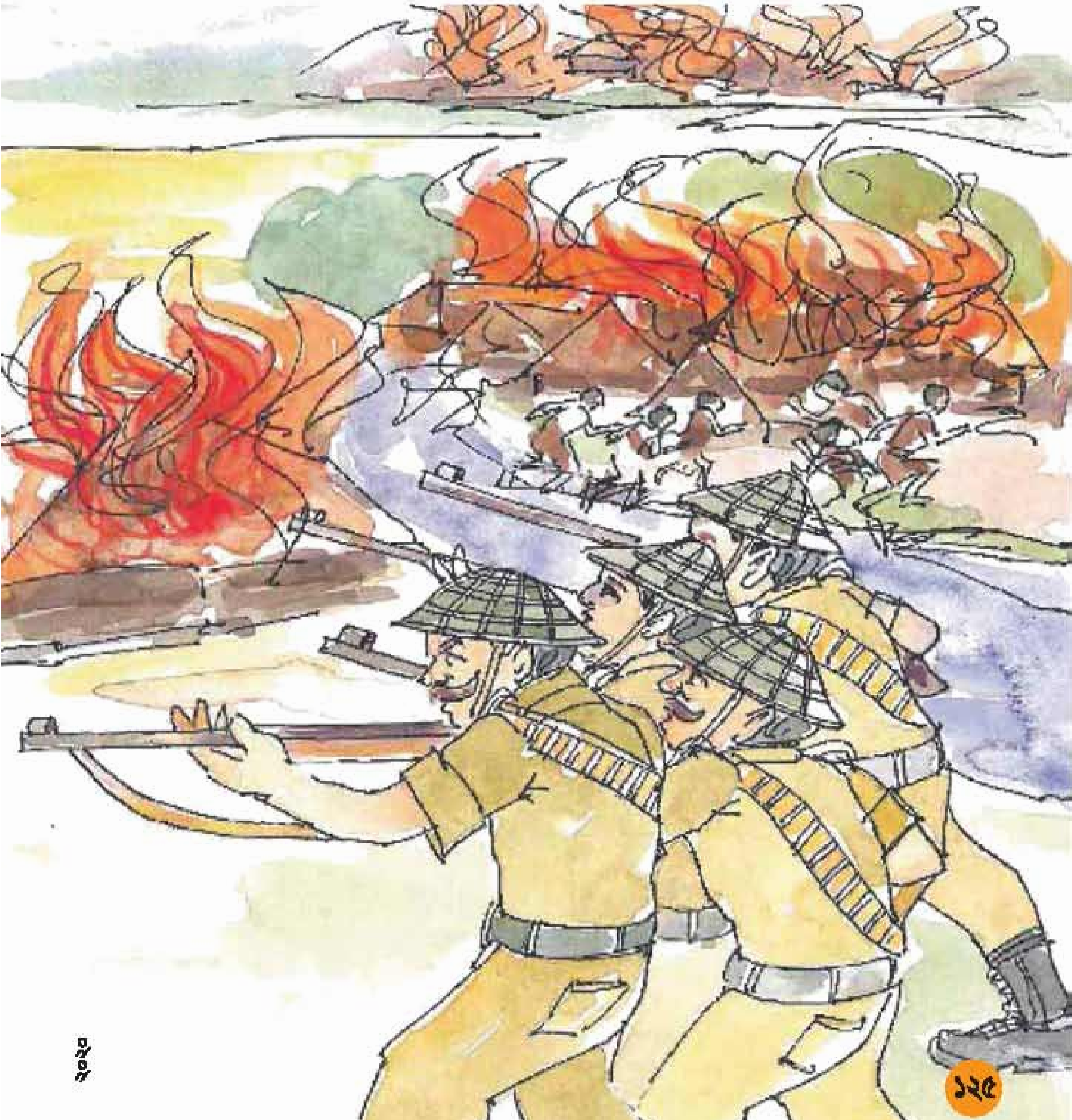

দুই বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে। ভাত খায়। নয়তো একটু ঘুমিয়ে নেয়। রাতের অন্ধকারে আবার চলে যায়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে।

রুমা আর রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না।

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য,

– খুকুমণিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খুশবু উদগ্রীব বিবিসি গণহত্যা বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং গপগপিয়ে মুক্তিবাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মিলিটারি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বঙ্গবন্ধুর	মিলিটারির	গণহত্যা	উদগ্রীব	বিবিসির	মুক্তিযোদ্ধারা

ক. রুবা .... হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

খ. সবাই আমগাছের নিচে বসে রেডিওতে .... খবর শুনছে।

গ. ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে .... শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

ঘ. জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা .... ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল।

ঙ. বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি .... সামনে পড়ে যায় জসীম।

চ. রাতে .... এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

খ. রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

গ. রাহেলাবানু প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে দিত কেন?

ঘ. গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

চ. "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা।"– "অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

ছ. একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?

১. বইয়ের ভিতর ২. বালিশের নিচে

৩. কৌটার ভিতর ৪. খাতার ভিতর

খ. আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?

১. বাজারের খবর ২. যুদ্ধের খবর

৩. গণহত্যার খবর ৪. বাড়ির খবর

গ. রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে–

১. বাবার মরে যাওয়া ২. মায়ের মরে যাওয়া

৩. ভাই বোনের মরে যাওয়া ৪. স্বামী মরে যাওয়া

ঘ. কখন শিউলি ফুল ফোটে?

১. আশ্বিন মাসে ২. কার্তিক মাসে

৩. দিনের বেলা ৪. মাঘ মাসে

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সাজাই

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারোর নাম, জায়গার নাম বোঝায় সেগুলো বিশেষ্য। যেমন– নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে 'নদী' বিশেষ্য পদ। আবার এমন শব্দ আছে যা দিয়ে বিশেষ্য শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন– মুনা দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এখানে 'দ্রুত' বিশেষণ পদ। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ আলাদা করি।

গাছ, ভাত, শুকনো, ভীষণ, নদী, কাঁপা, দরজা, রাইফেল, গরম, গভীর, হাঁড়ি, দ্রুত।

বিশেষ্য	বিশেষণ
নদী	গরম
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

জন্ম	মৃত্যু	যুদ্ধের সময় দেশের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল।
কান্না	....	....
ভরা	....	....
যুদ্ধ	....	....
দূর	....	....
শুকনো	....	....

৭. বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন আয়ু অপেক্ষা মুক্তিযোদ্ধা রেডিও

৮. কথাগুলো বুঝে নিই।

ধপাস করে পড়া – হঠাৎ ধপ করে পড়া। ট্রাক থেকে চালের বস্তাটি ধপাস করে পড়ে গেল।

মুখ থুবড়ে পড়া – উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

গপগপিয়ে খাওয়া – একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে দ্রুত খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।

দুই সের – আমাদের দেশে আগে ওজন মাপের জন্য ‘সের’ ব্যবহার করা হতো।
১ সের পরিমাণ বর্তমান মাপে ১ কেজির কিছু কম (প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)।
১ কেজি = ১.০৭ সের (প্রায়)

৯. কর্ম-অনুশীলন।

আমার শ্রেণিশিক্ষক, মা-বাবা, দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।

সেলিনা হোসেন

লেখক-পরিচিতি

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৪ই জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমিতে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ‘সাগর’, ‘গল্পে বর্ণমালা’, ‘কাকতাড়ুয়া’, ‘চাঁদের বুড়ির পান্তা ইলিশ’ ইত্যাদি তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ২০০৯ সালে ‘একুশে পদক’ লাভ করেন। ২০১০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে তিনি ডিলিট উপাধি পান। ২০১১ সালে দিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ পান।

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
অ	
অচিনপুর	– অচেনা স্থান।
অবধারিত	– অনিবার্য, যা হবেই, নির্ধারিত ।
অবরুদ্ধ	– শত্রু দিয়ে বেষ্টিত, বন্দী।
অহংকার	– নিজে অনেক বড় কেউ – এরকম মনে করা।
অপার	– অগাধ, অসীম।
অনাড়ম্বর	– সাদাসিধা।
অমিত তেজ	– অসীম সাহস আর অদম্য শক্তি।
অভিভূত	– ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া।
অসিচালনা	– তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার বিদ্যা।
অমূল্য	– যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।
আ	
আসন্ন	– নিকট।
আচ্ছাদন	– ঢাকনি, ছাউনি।
আত্মদানকারী	– নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি।
আত্মসমর্পণ	– সম্পূর্ণরূপে অন্যের বশ্যতা স্বীকার।
আনকোরা	– নতুন।
আস্তানা	– বসবাসের জায়গা।
আষ্টেপৃষ্ঠে	– সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
আরাফাত	– মক্কা থেকে প্রায় বারো মাইল পূর্বে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ময়দান।
আমির	– বড়লোক; ধনী; সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান; মুসলমান শাসকের উপাধি
ই	
ইঙ্গিত	– ইশারা।
উ	
উদ্‌গ্রীব	– প্রতিমুহূর্ত অপেক্ষা করা, খুব আগ্রহী, ব্যগ্র ।
উপত্যকা	– দুই পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি অথবা পাহাড়-পর্বতের পাশের ভূমি।
উপাসনা	– এবাদত; আরাধনা; আল্লাহর ধ্যান।
ঊ	
ঊর্মি	– নদী ও সাগরের ঢেউ।
ঊর্মিমালা	– ঢেউসমূহ, ঢেউগুলো।
এ	
এফএ	– (Final Arts) আজকের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সমতুল্য।
এক্সপেরিমেন্ট	– পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
ঐ	
ঐতিহাসিক	– যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন। ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য বা ইতিহাস-ভিত্তিক হলেও তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।
ক	
কল্পকাহিনি	– যে কাহিনি কল্পনা করে লেখা হয়। এক প্রকার কল্পকাহিনি আছে যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে লেখা হয়, তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।
কানাডা	– উত্তর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ।
কারারুদ্ধ	– জেলখানা বা কারাগারে আটক রাখা।
কাবাশরিফ	– মক্কায় অবস্থিত বিখ্যাত আল্লাহর ঘর।
কড়ি	– এক ধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক।
কিচির মিচির	– পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ।
কিরণ	– আলো।
ক্রীতদাস	– কেনা গোলাম; মূল্য দিয়ে যে ভৃত্যকে যাবজ্জীবনের জন্য কেনা হয়েছে।
কুমার	– রাজার ছেলে (রাজকুমার)।

কুর্নিশ – মাথা নত করে অভিবাদন করা।

কাঁকন – হাতে পরার গহনা।

কোলাহলকল – কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল। আর 'কল' বলতে বোঝায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে এক সঙ্গে গোল–গোল চিৎকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে 'কোলাহলকল' বলা হয়েছে।

ক্যাম্প – সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি। সেনাছাউনি।

খ

খাজনা – কর বা ট্যাক্স।

খাটিয়া – কাঠের তৈরি খাট।

খুশবু – সুগন্ধ

খ্রিস্টপূর্ব – যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোঝাতে বলা হয় খ্রিস্টপূর্ব, আর তাঁর জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় খ্রিস্টাব্দ।

ক্ষ

ক্ষত – শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।

গ

গপগপিয়ে – গপগপ করে।

গণহত্যা – অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা।

গহ্বর – গর্ত।

গর্জে ওঠা – হুংকার দিয়ে ওঠা।

গর্দান – ঘাড়, গলা।

গিরিডি – ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। এটি গিরিডিহ্ জেলার একটি প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।

গেরস্ত – গৃহস্থ, সংসারী লোক। গেরস্ত লোকের বহু কাজকর্ম থাকে।

ঘ

ঘোর – অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।

চ

চকাচকি – হাঁসজাতীয় পাখি।

চন্দ্রলোক – চাঁদের দেশ।

চরণ – পা।

চিনচিন – অল্প অল্প ব্যথা বা জ্বালা বোঝায় এমন শব্দ।

জ

জগৎ – পৃথিবী।

জনপদ – যেখানে অনেক মানুষ এক সাথে বসবাস করে, লোকালয়, শহর।

জেদি – একগুঁয়ে, কোনো কাজ করতে যে নাছোড়বান্দা।

ট

টনটন – যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি।

টহল – পাহারা দেওয়া।

টেপা পুতুল – কুমাররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত–পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যত্ন করে লাগাতে হয়।

টেরাকোটা – 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত।

টুকটুক – গাঢ়, সুন্দর।

ট্রেনিং – কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া।

ড

ডনকুস্তি – বুকডন দিয়ে শরীরচর্চা আর শারীরিক শক্তির পরীক্ষা।

ডিঙি – একধরনের নৌকা।

ড্রিবলিং – এটা ফুটবল খেলার একটা কৌশল। ইংরেজি dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ত

তট – নদীর তীর।
তটস্থ – ব্যতিব্যস্ত ।
তারারা – আকাশের তারকারাজি।
তিরিক্ষি – খারাপ মেজাজ।
তুলকালাম কান্ড – এলাহি কান্ড।
তেস্টা – তৃষ্ণা, পিপাসা। তেস্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দ

দাপটে – প্রবল প্রতাপের সঙ্গে।
দুর্গ – প্রাচীর বা দেয়াল ঘেরা সেনানিবাস।
দুর্ভেদ্য – যা কস্টে ভেদ করা যায়।
দুঃসাহসী – অত্যধিক সাহস আছে এমন।
দিগন্ত – প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
দ্রুত গতিতে – খুব তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
দেশান্তর – অন্য দেশ।
দোলাই মাথা – মাথা নাড়াই।

ধ

ধরা – পৃথিবী।

ন

নকশা – রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। শখের হাঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমার শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
নিশিরাত – গভীর রাত্রি। মাঝ রাত।
নির্জন – জনশূন্য স্থান।
নিদর্শন – প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
নির্বিচারে – কোনো রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া।
নির্যাতিত – অন্যায়ের শিকার, নিপীড়িত।

প

পতন – পড়ে যাওয়া।
পরস্পর – একের সঙ্গে অন্যের।
পরাধীন – পরের অধীন, স্বাধীন নয়।
পন্থা – পথ।
পট্টি – কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে।
পর্যবেক্ষণ – কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
পাখপাখালি – নানা ধরনের পাখি।
পাষণ্ড – নির্দয়।
পাণ্ডিত্যপূর্ণ – জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।
পুঁটলি – বোঁচকা।
প্রকৃতি – নিসর্গ।
প্রাচীনতম – প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে তম যোগ করা হয়।
প্রান্তর – মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ ভূমি।
প্রতিবাদী – যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায়।
প্রতিধ্বনি – বাতাসে ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।
প্রবাসী – ভিন্নদেশে যে বাস করে।
প্রবাহিত হওয়া – বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।
প্রবেশিকা/প্রবেশিকা পরীক্ষা – আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। প্রবেশিকা পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত। তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।
প্রত্নতাত্ত্বিক – প্রত্ন শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। তবে, প্রাচীন কালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেভাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক।
প্রপাত – উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন ।
প্রক্ষালন – ধোওয়া, পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

ফ

ফরমায়েস – হুকুম, আদেশ।
ফুরসত – অবসর, অবকাশ, ছুটি।
ফেরিঅলা – রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন।
ফেড়ে – ছিড়ে।
ফোটে – প্রস্ফুটিত হয়, ফুটে ওঠে।

ব

বরণ – সাদরে গ্রহণ।
বরকন্দাজ – বন্দুকধারী সিপাই বা রক্ষী।
বজ্র – ভীষণ শব্দ করে ঝড়ের আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাওয়া, বাজ।
বন্ধ – বন্ধ।
বঙ্গবন্ধু – জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি।
বর্গি – মারাঠা দস্যু।
বরেণ্য – মান্য।
বাহার – সৌন্দর্য।
বারি – পানি। (শব্দটি শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয়।)
বান্দা – গোলাম; দাস; একান্ত বাধ্য।
বিজু – চাকমাদের নববর্ষ উৎসব।
বিজয়স্তম্ভ – কোনো কিছু জয় করার পর যে স্তম্ভ নির্মাণ করে বিজয় ঘোষণা করা হয়।
বিবিসি – যুক্তরাজ্যের বেতার কেন্দ্রের নাম।
বিলুপ্ত – যা লোপ পেয়েছে।
বিস্বাদ – খেতে মজা নয় এমন।
বিষ-নজর – হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি, কুনজর।
বেলাভূমি – সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান।
বেণুবন – বাঁশবাগান।
বৈচিত্র্য – বিভিন্নতা।
বাঁশের কেল্লা – বাঁশ দিয়ে তৈরি কেল্লা বা দুর্গ।

ভ

ভয়ঙ্কর – ভীষণ, ভীতিজনক, অত্যন্ত।
ভাষণ – বক্তৃতা, বিবৃতি, উক্তি।

ম

মহানবি – আল্লাহর পয়গম্বর; রাসুল; প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি। শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে মহানবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
মজলুম – অত্যাচারিত, নির্যাতিত।
মহান – শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার।
মনস্বী – উদারমনা।
মহাকলরব – কলরব শব্দের অর্থ অনেক মানুষের গলায় এক সাথে চেঁচামেচি, আওয়াজ। মহাকলরব অর্থ–ভীষণ চিৎকার, চেঁচামেচি।
মরণ–যন্ত্রণা – মৃত্যুর কষ্ট।
মায়াবতী – দয়া, মমতা আছে যে নারীর।
মালিশ – যে ওষুধ বা মলম চেপে–চেপে শরীরে লাগাতে হয়।
মিলিটারি – সামরিক বাহিনী। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।
মুক্তিকামী – স্বাধীনতাকামী।
মুক্তিবাহিনী – শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল।
মুক্তিযোদ্ধা – যিনি স্বাধীনতা বা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন।
মুগ্ধ – বিমোহিত, আনন্দিত।
মেদিনী – ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবী।
মোহ – অজ্ঞান, মায়া, মূর্ছা।
মৃৎশিল্প – মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প।

য

যশস্বী – বিখ্যাত, কীর্তিমান।
যিলকাদ – আরবি বছরের একটি মাসের নাম।
যুগান্তর – অন্যযুগ বা সময়।

র

রয়েল – রাজকীয়।

রক্তরঞ্জিত – রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে যা।

রক্ষী – প্রহরী, সেনা।

রাজপ্রাসাদ – রাজপুরি বা রাজবাড়ি।

রুক্ষমূর্তি – উগ্ররূপ।

ল

লবেজান – হয়রান।

শ

শখ – মনের ইচ্ছা, রুচি।

শখের হাঁড়ি – শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়, তাই এর নাম শখের হাঁড়ি।

শক্তিধর – শক্তি আছে যার।

শঙ্কিত – ভীত।

শব্দদূষণ – অত্যন্ত কোলাহলে শব্দদূষণ ঘটে।

শালবন বিহার – কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টাদশ শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারেও পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।

শাহানশাহ – বাদশাহ, রাজাধিরাজ।

শাহজাদা – বাদশার পুত্র।

শায়িত – শুয়ে আছে এমন।

শায়েস্তা – শাস্তি, জব্দ।

শির – মাথা।

শিল্পী – যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন তিনিই শিল্পী। যেমন– সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী।

স

সংকল্প – প্রতিজ্ঞা।

সরকার – দেশ চালায় যে।

সমতল ভূমি – যে জমি উঁচুনিচু নয়, পাহাড়ী নয়, তাকেই সমতল ভূমি বলে।

সমস্বরে – একসঙ্গে শব্দ করা বা কথা বলা।

সম্মেলন – জনসমাবেশ।

সমাবেশ – একত্রে অবস্থান।

সার্থক – সফল।

সাংগ্রাই – রাখাইনদের নববর্ষ উৎসব।

সিন্ধু – সাগর।

সের – পুরানো পদ্ধতির ওজন মাপার একক (১ সের= প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)।

স্নেহ-কণা – আদর

স্বাদ – খেতে ভালো লাগে এমন।

স্বজন – নিজের লোক, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব।

স্বর্ণলতা – সোনালি রঙের বুনো লতা। অনেক সময় পথের ধারের গাছগাছালি ভরে থাকে। এই লতা আপনা-আপনি জন্মায়।

সৌভাগ্য – ভালো ভাগ্য।

সম্ভার – বিভিন্ন উপাদান, বিভিন্ন জিনিস।

স্রোতস্বিনী – নদী।

হ

হানাদার – আক্রমণকারী।

হুঙ্কার – চিৎকার।

হজ – হিজরি জিলহজ মাসের ৯ তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে ইহরাম বেঁধে মক্কার অদূরবর্তী আরাফাত ময়দানে অবস্থান ও পরে কাবার তওয়াফ সংবলিত ইসলামি অনুষ্ঠান।

হিজরি – যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৬২২ বছর পরে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমনের (হিজরতের) দিন থেকে গণিত চান্দ্র অব্দ বা বছর।

সমাপ্ত

২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫ম-বাংলা

পরনিন্দা ভালো নয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য